শ্রীবিরূপাক্ষ

ঝঞ্ঝাট

স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক
লিখিত ভূমিকা সমেত
(প্ল্যানচেটে লিপিবদ্ধ)

শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র বর্ণিত

বিহার সাহিত্য ভবন লিঃ
২৫।২, মোহনবাগান রো,
কলিকাতা-৪

প্রথম সংস্করণ

অগ্রহায়ণ ১৩৫৬

২য় সংস্করণ

জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮

৩য় সংস্করণ

আষাঢ় ১৩৬১

প্রকাশক

শ্রীশক্তিকুমার ভাদুড়ী

দি বিহার সাহিত্য ভবন লিঃ

২৫।২, মোহনবাগান রো,

কলিকাতা-৪

মুদ্রাকর

শ্রী বি, এন, ঘোষ

১২।১, হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

আইডিয়াল প্রেস।

মূল্য : তিন টাকা মাত্র

নিবেদন

বাংলাদেশ চুঁড়েও ঝঞ্চাটের ভূমিকা লেখার জন্যে লোক পাওয়া গেল না। বন্ধু-বান্ধব সাহিত্যিকরা সবাই স্রেফ ব'লে দিলেন যে, ঝঞ্চাটের আবার ভূমিকার দরকার হয় নাকি, ও তো বিনা ভূমিকাতেই এসে হাজির হয়, তুমি এমনই ছাপাও। মানে, বুঝলুম বন্ধুর জন্যে দু কলম লিখে উপকার করবার ঝঞ্চাটও কেউ ঘাড়ে নিতে রাজি নন। অগত্যা স্বর্গীয় পাঁচকড়িবাবুকে প্ল্যান্‌চেটের মারফৎ নামিয়ে তাঁকে দিয়েই ও-কার্যটা করিয়ে নিলুম—তাও কি প্ল্যানচেটে সহজে আনা যায়? সে কি ঝঞ্চাট মশাই! উপর্যুপরি তিনটে মাম্‌দো ভূত, কিম্ভুত, অদ্ভুত সব এসে হাজির হ'ল—প্রায় ধ্যুৎ ব'লে ছেড়ে উঠে যাচ্ছি তখন বাঁড়ুয্যে মশাই এসে হাজির। আমার রাগ দেখে তিনি আমায় বললেন, আমাকে আবার টানাটানি করা কেন বাবা, স্বর্গ থেকে আসা চাট্টিখানি কথা, সে কি এখানে, কখনও তো সেখানে যাও নি—ভবিষ্যতেও তোমার যাবার আশা নেই, তা বুঝবে কি ক'রে বল?

আমি বললুম, নেহাৎ আপনার জীবিতকালে ভক্তি শ্রদ্ধা করতুম তাই ডাকলুম, তা না হ'লে—

তিনি কথা শেষ না-করতে দিয়েই ব'লে উঠলেন, বেশ বাবা, আর কথা বাড়িয়ে দরকার নেই আমি লিখে দিচ্ছি। আমার শেষ প্রণামটা নেবার জন্যও তিনি অপেক্ষা করলেন না। 'ইতি' লিখেই চ'লে গেলেন। তাঁর নাম ভাঁড়িয়ে আর কেউ কিছু ওটা লিখে গেলেন কি না তা স্বর্গের লোক ছাড়া আমাদের বলবার উপায় নেই। যাই হোক, কৃতজ্ঞতা তাঁর উদ্দেশেই নিবেদন কচ্ছি।

কলকাতা অল্ ইণ্ডিয়া রেডিও অনেকগুলি ঝঞ্চাটের জন্যে দায়ী, তাঁদেরও

কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং যিনি আমার ঝঞ্ঝাটকে বর্ণনা ক'রে সকলের শ্রুতিগোচর করেছেন সেই অভিন্ন হৃদয় বন্ধু বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রকেও ধন্যবাদ না জানালে নেহাৎ বজ্জাতি করা হয় বলে তাঁকেও সহস্র ধন্যবাদ।

ছাপাখানা, কম্পোজিটর প্রভুরা, পূর্ণিমা সাহিত্য মন্দির প্রভৃতি সকলে মিলে যে ভাবে ঝঞ্ঝাটকে পাকিয়ে তুলেছেন তাতে কৃতজ্ঞতা তাঁদেরও প্রাপ্য। অতএব মর্ত্যলোকে ভদ্রতার খাতিরে যাঁদেরই কাছে দাঁত বার ক'রে সৌজন্য প্রকাশ করার রীতি তাঁদেরই সকাশে যথারীতি, প্রীতি না থাকলেও, রীতি হিসেবে নির্দন্ত বিকশিত ক'রে মাড়ি দেখিয়ে যাচ্ছি। আশা করি এতেই সবাই খুশী হবেন। বইখানি দয়া ক'রে কিনে পড়বেন তাহ'লেই বিরূপাক্ষ কৃতার্থ হবে। এই তার পাঠকবর্গের কাছে নিবেদন। ইতি—

সংসারালয়
কলিকাতা

—শ্রীবিরূপাক্ষ

উৎসর্গ

আমার তথাকথিত বন্ধু-বান্ধব

আত্মীয়-স্বজন

ও

গুষ্টিবর্গের হাতে

১৩৫৬ }
১৯৪৯ }

ইতি

শ্রীবিরূপাক্ষ

ভূমিকা

(প্ল্যানচেটের সাহায্যে লিপিবদ্ধ)

মত্যলোক হইতে শ্রীমান্ বিরূপাক্ষ তাঁহার ঝঞ্ঝাটের ভূমিকা লিখিবার জন্য সহসা আমাকে আহ্বান করিয়া এখানেও ঝঞ্ঝাট বাধাইয়া বসিয়াছেন। এই নিশ্চিন্ততার রাজ্যে আর যাহাই থাক্ ঝঞ্ঝাট নাই। তাহা ছাড়া স্বর্গ একরূপ খালিই পড়িয়া আছে, বাড়ী এত সস্তায় ভাড়া পাওয়া যাইতেছে যে কহতব্য নয়। কিন্তু মর্তে ও নরকে ভীড়েরও কমতি নাই, ঝঞ্ঝাটেরও শেষ নাই। স্বয়ং যমরাজ হইতে তাঁহার আদালতের চাপরাশীরা পর্যন্ত অষ্টপ্রহর খাদ্য-সমস্যা, বাস্তু-সমস্যা ও পুনর্বসতি লইয়া মাথা ঘামাইয়া মরিতেছেন কিন্তু অমর বলিয়া মরিতে পারিতেছেন না। বজ্জাত লোকেরা যাহা খুশি মুখে আসিতেছে তাহা বলিয়া গালি পাড়িতেছে, স্ত্রীলোকেরা, 'আ মর্ মিন্সে, তোর এখানে সব ঝঞ্ঝাট কাটিয়ে আসবো ব'লে পৃথিবীতে দিনরাত চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়েছি কিন্তু এখানে এসেও একটু নিশ্চিন্দি হবার জো নেই? আর তোর কোন্ মুখপোড়া ভায়রাভাই আছে বল্, নয় তার বাড়ীই যাই!' বলিয়া মাথার ঝিকুট তুলিয়া ফেলিতেছেন।

যম বেচারী ঘামিয়া অস্থির। স্ত্রীলোককে কয়েদ করিয়া রাখিতে পারেন কিন্তু বেইজ্জতী করিবার অধিকার তো তাঁহার নেই, তাই তাঁহার অবস্থা খুবই কাহিল হইয়া পড়িয়াছে। শুনিতেছি তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে বদ্‌লীর জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন কিন্তু সেখানে যেরূপ ফাইল জমিয়াছে তাহা যে আগামী বছর পঞ্চাশের পূর্বে ক্লিয়ার হইবে তাহা তো মনে হয় না। খাদ্য, বস্ত্র, পুনর্গঠন, নদী-নালা কর্তন, অর্থ, শত্রু নিপাতের আবেদন প্রভৃতি এত বায়নাক্কা চাপিয়াছে যে, স্বর্গের দুর্গগুলিকে লোক ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য পুনঃসংস্কার করা হইতেছে। তবে ভরসা এই যে এখানে এটম্ বম দিয়া শত্রু মারার প্রয়োজন হয় না, অন্তর টিপুনি দিয়াই আমরা শত্রু কহিল করিবার মন্ত্র জানি।

কিন্তু দূর দিগন্তের পার হইতে মাঝে মাঝে বেতার যোগে বিরূপাক্ষ মারফৎ অসন্তোষের আওয়াজ আমাদের কানেও আসিয়া পৌছিয়াছে। তাঁহার পরিণাম কি হইবে তাহার পরিকল্পনা করিতে করিতে স্বয়ং পিতামহ ব্রহ্মার পর্যন্ত ঘুম নাই। সকলেরই ভয় এই দুর্মুখ লোকটাকে যেখানে রাখা হইবে সেখানে থাকিয়াই সে ঝঞ্ঝাট সৃষ্টি করিবে এবং অকুতোভয়ে অনর্গল বকিয়া যাইবে। নেহাৎ বাঙালী বলিয়া উহার ঝঞ্ঝাটের খবর পৃথিবী টের পায় নাই, নচেৎ কি হইত বলা যায় না।

সম্প্রতি বিরূপাক্ষ আবার তাঁহার লেখাগুলি ছাপাইতেছেন অর্থাৎ দেবতাদের কি ভাবে সমালোচনা করিয়া কাৎ করিতে হয় তাহার উপায় বাৎলাইয়া দিতেছেন। লোকটা নাস্তিক ও হাড়বজ্জাত বলিয়া সকলের ধারণা হওয়াতে এখান হইতে তেত্রিশ কোটি উইপোকা পাঠানো হইতেছে; কারণ বাঙালী ক্রেতাদের কাছে বই কাটিবে না তাহা জানা আছে কিন্তু উই কাটিয়া তাঁহার লেখা ছাপাইয়া বাহির করার সাধ মিটাইবে। যাহাই হউক, আমাদের সকলেরই ইচ্ছা উহার ঝঞ্ঝাট যেন কোন সময় না কাটে। ইতি—

৪৯, পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত পাড়া
স্বর্গধাম

স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

খুব অল্পদিনের মধ্যে এই দুর্মূল্যের বাজারে ঝঞ্ঝাটের দ্বিতীয় সংস্করণ বেরুলো। দ্বিতীয় সংস্করণ কেন তৃতীয় সংস্করণও বেরিয়ে যেত এতদিন, যদি না কিছুদিন শহর থেকে গা ঢাকা দিতুম। কারণ, বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়বর্গ বইখানা বাঁধাবার অবকাশ দেন নি—দলে দলে হাণ্ডবিলের মত টেনে নিয়ে গেছেন—এবং যাঁরা এখনও পান নি তাঁরা এই দ্বিতীয় সংস্করণের ভরসায় ব'সে আছেন। এও খুব শিগগিরই ফুরোবে ব'লে মনে হয়। ছিঃ, ছিঃ, বাংলা দেশে ভদ্রলোকে যে কেন বই ছাপায় বুঝতে পারি না!

এক তো পাঠক নেই, তার ওপর যাও বা আছে তাদের ট্যাকে রেস্ত নেই, বাকি সব বিনা মূল্যের খদ্দের—খুব সুখ্যাতি করে বইয়ের, কিন্তু লেখককে কিছু দিতে হ'লেই গায়ে জ্বর আসে। বই কাটে—পোকায় নয়, বিয়ের উপহার দেবার সময়। কিন্তু ইদানীং অধিকাংশ জায়গায় রেজেস্ট্রী ক'রে চুপিচাপি বিয়ে হয়ে যাচ্ছে উপহারের বালাই নেই; আর যাদের ঘটা ক'রে বিয়ে হয় তাদের বউভাতে খাওয়া নেই, শুধু কাজু বাদাম আর এক কাপ কফি কি সরবৎ খেয়ে কেউ আর বই কিনে উপহারের কল্পনাও করে না—জোর চক্ষুলজ্জা এড়াবার খাতিরে ১।০ সিঁদুর কৌটো উপহার দিয়েই সামাজিকতা বজায় রাখে। কার ভূতে ধরেছে ৩৲ টাকার বই দেবে? পাঁচ সিকের পর বাকি পয়সায় খাবারের দোকানে ঢুকে পেটকে শান্ত করলে বরং কাজে দেয়।

তবু এ ছাপাবার দরকার কি—যদি জিজ্ঞাসা করেন তাহ'লে বলব, গেরো। আর একটা কথা, বাংলা দেশে এখনও কতিপয় পাগল আছেন যাঁরা আমার দলে অর্থাৎ পেটের ওপর যে স্থানটুকু আছে তার তৃপ্তিবিধানের জন্য এখনও কিছু পয়সা খরচ করেন—তাঁদেরই ভরসায় আবার এর আর এক সংস্করন প্রকাশ করতে এগিয়ে আসা গেল। ইতি—

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮

নিবেদক
—শ্রীবিরূপাক্ষ

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

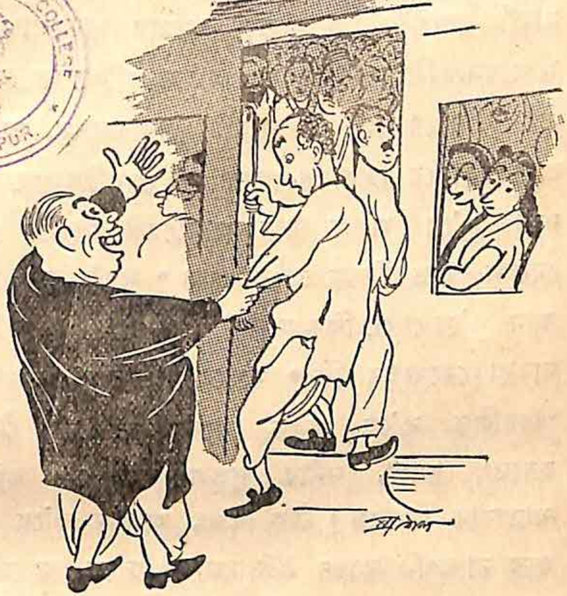
'ঝঞ্ঝাটের' তৃতীয় সংস্করণ হ'ল, এর জন্যে কাকে ধন্যবাদ দেব? বিধাতাকেই দিই—যদি তিনি থাকেন তাহ'লে বাংলাদেশের প্রত্যেকের সংসারে আর কিছু না পাঠালেও যেন একটা না একটা "ঝঞ্ঝাট" পাঠাবার বন্দোবস্ত করেন! তাতে তিনিও পরিতৃপ্ত হবেন আর আমার প্রকাশকও খুশী হবেন। আমি?—আমি তো ঐ নিয়েই সর্বক্ষণ মসগুল্।

আষাঢ়
১৩৬১

ইতি—
শ্রীবিরূপাক্ষ

সূচী

আপনি



দেখুন, একটা কথা বলি যদি কিছু মনে না করেন, আপনি কি দয়াদাক্ষিণ্য সমস্ত বিসর্জন দিয়ে আমার পেছনেই বরাবর লেগে থাকবেন? বাড়িতে তো নানান ঝঞ্চাটের জ্বালায় একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারি না, কিন্তু বাইরেতেও যদি আপনি এই রকম প্রাণ অতিষ্ঠ ক'রে তোলেন, তা হ'লে তো মারা পড়ি মশাই!

ট্রামে তো জায়গা থাকতেও দরজার সামনেটিতে দাঁড়িয়ে থেকে উঠতে দেবেন না; পকেট কাটবেন, কি মেয়েদের চলন্ত দেহের

ক্ষণিক স্পর্শে নিজেকে পুলকিত ক'রে নেবার জন্যে এই কীর্তি প্রতিদিন করবেন—তা বুঝতে পারি না ; যখন উঠবেন তখন তো আমি নামছি দেখেও এক ধাক্কায় আমার হাড়গোড় চূর্ণ করতে এগিয়ে আসবেন, সিগারেট সমেত হাইজাম্পশিপের কায়দা দেখিয়ে উঠে এই বাজারে আমার জামাটা পোড়াবেন, আবার সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে গেলে তো রেক্‌টিফায়েড স্পিরিটের মত দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠে আমাকেই মারতে আসবেন, উপদেশ দেবেন—এত ভিড়ে ওঠেন কেন ? সবই তো দুবেলা শুনে শুনে কান প'চে গেল, কিন্তু আপনার কায়দার ঠেলায় আমার চরণযুগলের অবস্থা দেখেছেন কি ? সকলে চতুর্দিক থেকে এই ভাবে আমাকে পদদলিত ক'রে ছেঁচে দেবেন, এটা কি ঠিক হচ্ছে ? বলবেন হয়তো, আহা, ননীর পুতুল ! কে না কষ্ট ক'রে আজকাল যাতায়াত করছে ! ঠিক কথা, আরাম ক'রে যাওয়া এ জীবনে হবে না জানি, কারণ প্রতিদিন বুঝছি যে সুস্থ দেহে আশপাশ থেকে আপনাদের নানারূপ সিরামের যে প্রয়োগ আমার ওপর দিয়ে চলেছে, তাতে আর বেশী দিন পৃথিবীতে আমাকে ভিড় বাড়াতে হবে না। বয়েস তো হয়েছে, এত উৎপাত সইবে কেন ? তবু একটু নেক্‌নজর করুন প্রভু। আচ্ছা, যাতায়াতের ভিড়ের কথা ছেড়ে দিন, আপনি আমার ওপর এত বিরূপ কেন বলতে পারেন ? আমি আপনার কি পাকা ধানে মই দিয়েছি ?

ট্রেনে ক'রে কলকাতায় এলুম, সেদিন আমায় এ রকম ভোগান্তি করালেন কেন বলুন তো ? এক ঘণ্টা আগে এসে স্টেশনে দাঁড়িয়ে রইলুম, দয়া ক'রে আমার টিকিটটা একটু আগে কেটে দিলে

আপনার কিছু ক্ষতি হ'ত কি ? অথচ আপনি যে কারুর কাটলেন না তা তো নয় ? ওপাশ থেকে ভাবের-লোকদের হাতে তো টিকিটগুলি নির্বিবাদে কেটে দিলেন। আপনি তো আমার সঙ্গে কথাই কইলেন না প্রথমে, দেখলেন ভিড় জমেছে খুব, তবু তো একটু দয়া হ'ল না দাদা ! ব'সে ব'সে চা খেলেন, পান খেলেন, মৌজ ক'রে বিড়ি ধরালেন, সবই তো ঘুলঘুলি দিয়ে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে চেয়ে দেখলুম। ভাবলুম, কৃপাময় বোধ হয় এইবার আমাদের প্রতি করুণা করবেন। কিন্তু আপনার ব'য়ে যাচ্ছে, আপনি টেবিলের ওপর পা তুলে খবরের কাগজটা টেনে পড়তে শুরু করলেন, আপনার অ্যাসিস্ট্যান্টকে ডেকে বীর বিক্রমে একটা হেডলাইন প'ড়ে শোনালেন—'শোন হে রমেশ, আমাদের স্বদেশবাসীর প্রতি অত্যাচার ; বেটারা প্রাদেশিকতা ক'রে ক'রে দেশটাকে খেলে'—অথচ এদিকে আপনার জাতভায়েরা একশো জন লাইন ক'রে দাঁড়িয়ে. তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নেই ! দশ কি পাঁচ মিনিট আগে আপনি দয়া ক'রে একবার উঠে জানালার কাছে এগিয়ে এলেন, বিরক্ত হয়ে সেই সময় আমি একটু লাইনের বাইরে গেছি অমনই হুস ক'রে ট্রেন এসে গেল: আপনি সবশেষে আমায় যখন মুখ ভেঙিয়ে ভাঙানি দিতে শুরু করেছেন, সেই সময় ট্রেনখানি 'হুত্তোর হুত্তোর' করতে করতে বেরিয়ে চ'লে গেল। এর পর তিন ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে, ঝড়-বৃষ্টি সব-কিছু ওরই মধ্যে ব'য়ে গেল, আপনারও ব'য়ে যাচ্ছে ! কিন্তু আমার নাজেহাল—এই আর কি !

খামকা এই ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে আপনার কি লাভটা হ'ল বলতে পারেন ? আমি কি বিলিতী জাহাজে চেপে এ দেশে পদার্পণ করেছি ?

শুধু কি আপনি ?—আপনার গুষ্টিবর্গ সবাইকেই আপনি কি সব ঘাঁটিতে বসিয়ে রেখেছেন, না, আপনিই পোষাক বদ্‌লে সর্বত্র ব'সে থাকেন, বুঝতে পারি না।

সেদিন মনি-অর্ডার করতে গেলুম, আপনি তো আমাকে মার-মুখো হয়ে তেড়ে এলেন। কেন মশাই, আমি তো আপনাকে বেয়ারিংয়ে মনি-অর্ডার নিতে বলি নি, একটু ভদ্রভাবে বললে আপত্তি ছিল কি ? এত রাগের কারণটা কি ? খাটুনি ! হায় রে, আপনি তো তবু চেয়ারে ব'সে পাখা খাচ্ছেন, আমরা যে গরমে ঠায় ঘণ্টা-দুয়েক বাইরে দাঁড়িয়ে আপনার চাঁদমুখখানি দেখছি, এতেও কি আপনার মায়া হয় না ?

বিল জমা দিতে যাই, সেখানেও দেখি আপনি সেই মেজাজ নিয়ে ব'সে আছেন। অত কথা কি, ছুটির দিনে বায়স্কোপে থিয়েটারে টিকিট কেটে আপনাদের উপকার করতে গেলুম, তার ভেতরেও আপনি যে রকম খিঁচিয়ে উঠলেন. যেন আমি পাস চাইছি। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দোব, আপনি অর্ধেক সময় তো তা ছুঁড়ে ফেলে দেবেন। ব্যাঙ্কে চেক ভাঙাতে যাব, কিন্তু সেটি একটু চালু হ'লে আমাকে তো কথা কইবার মত উপযুক্ত লোক ব'লে মনে করবেন না। আপনি খোঁজখবর দেবার জন্যেই আপিসে ব'সে আছেন, কিন্তু কোন বিষয়ে খোঁজ নিতে গেলে আপনার দাঁত-কিড়িমিড়ি শুনলে তো আত্মারাম শুকিয়ে যায়। আর বিপদে প'ড়ে আপনার কাছে ছুটে গেলে তো কথাই নেই, যাতে আরও জড়িয়ে পড়ি তার ব্যবস্থার জন্যে তো উঠে প'ড়ে লাগেন। কাপড়ের দোকানের লাইসেন্স পেলে তো আপনার থিয়েটারের

অ্যাকটারদের চেয়েও মেজাজ চড়া হয়ে যায় দেখি। থানা-পুলিস, আদালত, স্বদেশী নেতাগিরির কথায় আর কাজ কি! সবার ঠেলায় তো প্রাণ যায়। সরকারী কোন জায়গায় বসলে আর আপনাকে পায় কে? মেজাজ টাইফয়েডের রুগীর চেয়ে দু-ডিগ্রীর ওপর গরম, খুব ভদ্রলোক হ'লে চেঁচিয়ে অবশ্য আপনি ব'লে দেন, 'যান যান, বেশী বকবেন না, রিপোর্ট করুন গে।'

আরে মশাই, আপনি তো বললেন রিপোর্ট করুন, কিন্তু ঝঞ্ঝাটটা পোয়াবে কে বলুন তো? আর কথায় কথায় রিপোর্ট ক'রে চলতে গেলে তো হোঁচট খেতে খেতেই প্রাণান্ত হয়! আপনি রুল দেখাবেন সত্যি, কিন্তু অত মুখস্থ থাকলে তো হাইকোর্টে আমার জায়গাটা আর খালি প'ড়ে থাকত না, সেটা স্মরণশক্তির অভাবে পারি নি ব'লেই তো প্রতিনিয়ত আপনার রুল এবং গুলের ঠেলায় চোখে সর্ষেফুল দেখছি। এর থেকে আপনি একটু ক্ষেমাঘেন্না ক'রে রেহাই দিলে যে বাঁচি।

উঃ! সংসারে এত ঝঞ্ঝাট—এ কি কোন দিন কল্পনা করতে পেরেছি? তা হ'লে কার্তিকের দোহাই, বিশ্বাস করুন, এ জায়গা বহু পূর্বে ছেড়ে পালাতুম। আপনি ঈশ্বরের বরপুত্র জানি, কিন্তু আমরা তা না হ'লেও পুষ্যিপুত্র তো বটে, কিন্তু আমাদের এই ভাবে লাঞ্ছিত করাটা কি আপনার ধর্ম হচ্ছে?

আপনি দুধে জল মেশাবেন, আমাকে তা খাঁটি দরে কিনতে হবে; আপনি ঘিয়ে সাপের ব্যাঙের চর্বি মেশাবেন, আমায় তা গব্য ঘৃত ব'লে মেনে নিয়ে গলাধঃকরণ করতে হবে; আপনি পচা মাছ, বাছপড়া আলু চালান দেবেন আমায় তা পয়সা দিয়ে কিনতে

হবে। যদি প্রতিবাদ করতে যাই, আপনি সকলের সামনে খপ্ ক'রে আমার হাত থেকে জিনিস কেড়ে নেবেন। বাসে ট্রামে ওঠাবেন, কিন্তু নামবার সময় রেলওয়ে-মেল যেমন পোস্টব্যাগ ফেলে দিয়ে যায়, তেমনই ছুঁড়ে ফেলে দেবেন। আপনি হোটেলে পচা মাল ভেজিটেবল ঘিয়ে লঙ্কা দিয়ে ভেজে আমার ক্ষিদের সুযোগ নিয়ে যাতে খুব শিগ্‌গির সব ঝঞ্ঝাট কাটিয়ে ওপর দিকে যেতে পারি হাসিমুখে তার বন্দোবস্ত ক'রে দেবেন। রাস্তায় যখন চলবেন, তখন কনুয়ের গুঁতো মেরে হাঁটবেন, আমার জামার হাতার সঙ্গে আপনার ছাতা আটকে গেলেও আপনি তাই চড়্‌চড়্ ক'রে ছিঁড়তে ছিঁড়তে চলবেন। আমি রাত্তিরে খেটেখুটে এসে একটু চোখ বুজব, অমনি পাশের বাড়ির জানালার পাশে ব'সে—হয় বাবা আদমের আমলের একটা গ্রামোফোন ও তাঁর সামসাময়িক খানচারেক রেকর্ড বাজাতে শুরু করবেন, নয় পনেরো-কুড়ি টাকার একটি হারমোনিয়ম নিয়ে প্রাণপণ বেসুর চীৎকার ক'রে রাত একটা আন্দাজ মুক্তি দেবেন। এই ভাবে আমাকে পাগল ক'রে আপনার কি সুখটা হচ্ছে সেটা তো বুঝতে পাচ্ছি না!

আপিসে চলেছি, আপনি ওপর থেকে এক ঝোড়া কুটনোর খোসা কিংবা পানের পিচ মাথায় ফেলে দিলেন, নেহাৎ তা না দিলেও জল খেয়ে অন্তত আধ গেলাস আমার মাথায় ছুঁড়ে দিলেন—এটা কি খুব ভাল হ'ল?

ঘরে ব'সে আছি, আপনি সেখানে ব'সে পানের পিচ ফেলছেন, রাস্তার ফুটপাতে আপনি আঁবের খোসা ছড়িয়ে আমাকে নিপাতিত করার চেষ্টা করছেন, আমি যা সাজাচ্ছি আপনি তা

নষ্ট করেছেন, আমি একটা কিছু গড়লে আপনি তা সর্বাগ্রে যাতে ভাঙে তার জন্যে আদাজল খেয়ে উঠে প'ড়ে লেগেছেন, আমি ভুল ক'রে আপনার দেশে জন্মগ্রহণ ক'রে ফেলেছি ব'লেই কি আপনি আমার ওপর এত ক্ষেপে আছেন? দয়াময়, একটু স্থিরচিত্তে আমার অবস্থাটা ভাবুন, আর কটা দিন এই সব বাজে ঝঞ্ঝাটের হাত থেকে রেহাই দিয়ে আমায় একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে দিন প্রভু!



ন'টে শাকটি মুড়োল



পশ্চিমাঞ্চলে একটা প্রবাদ আছে যে, 'দিল্লীকা লাড্ডু যো খায়া উও পস্তায়া, যো নেহি খায়া উওবি পস্তায়া'! কথাটা যে কত খাঁটি, তা চার ধার দিয়েই প্রমাণিত হতে শুরু হয়েছে, কি বলেন ?

এতদিন টাকা না থাকলে প্রাণ যেত, এখন টাকা থেকে যে প্রাণ যায় দাদা! যে সব বড় বড় নোটের তাড়া নিয়ে লোকে গোঁপে চাড়া দিয়ে ঘুরে বেড়াত, এখন সেগুলোকে নিশ্চিন্দি হয়ে কোথায় ঝাড়া যায়, তার জন্যে তো দেখি পাড়ায় পাড়ায় সোরগোল প'ড়ে গেছে—অন্তত আমাদের পাড়ায় তো বটেই।

যে পুঁজিবাবু মনে করুন, এক পয়সা চাঁদা কখনও দিতেন না—এখন তিনি ক্লাবে ক্লাবে গিয়ে বলছেন, বাবা—হাজার খানেক টাকা তোদের দিচ্ছি, তোরা আমায় শ চারেক টাকা ফেরত দে, বাকি তোরাই নে মাণিক !

ছোঁড়ারাও তেমনই তুখড়, বলে, ও আর ফেরত দিয়ে কি হবে ? পূরোপূরি আমাদেরই দিয়ে দিন। আমরা সরস্বতী ঠাকুরের চাল-চিত্তিরের ওপর বাঁধিয়ে রেখে দোব, তবু পাঁচজনে দেখবে।

তিনি কোন মতে রাগ চেপে সেখান থেকে চ'লে গেলেন। তা ছাড়া উপায় কি ?

এত দিন ধরুন, যে-জিনিস সকলের মান বাড়িয়েছে, আজ সেই জিনিসই যে মানকচু হয়ে ঝঞ্ঝাট বাধাচ্ছে।

হাজার, দশ-হাজারের নোট নিয়ে এ কি ফ্যাসাদ!

ভোট যোগাড় করতে গিয়ে ভোটাররা নাকের ওপর দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে গেলে মুখের যে অবস্থা হয়, এখন তেমনই ব্যাঙ্কে বড় বড় নোট ভাঙাতে গিয়ে ভাঙানি না পেয়ে মুখের অবস্থা তার চেয়ে খারাপ দাঁড়াচ্ছে। এখন তো ওগুলোকে হরির লুটের মত বিলোন ছাড়া কোন পথ নেই দেখছি। কত লোকের কত স্কিম ছিল, সব গেল ঘুলিয়ে এখন দশ-বিশ হাজার নোটের তাড়া নিয়ে লোকে হিমসিম খাচ্ছে।

ওঃ, কি আপদ বুঝুন!

এর চেয়ে দু-এক মাস আগে যদি হরিজন ফাণ্ডেও এঁরা এগুলো দিয়ে দিতেন, তা হ'লে অন্তত নামটা অক্ষয় হয়ে থাকত, লাখ লাখ টাকার নোট নিয়ে চোট খেতে হ'ত না; কিন্তু তা তো অনেকে করলেন না কোট ক'রে ব'সে রইলেন, কাউকে এক আধলা দোব না, তার ফলে রুই কাতলা সবাইকে এক জালে ফেলে আসল জায়গা থেকে রাম-ধোলাই দিয়ে দিলে।

যদি বলেন, তোমার যে খুব স্ফূর্তি! কত লোকের সর্বনাশ হয়ে গেল তার খোঁজ রাখ?

আজ্ঞে না। কার খোঁজ রাখব বলুন? কেউ কি আগে খোঁজ দিয়েছেন? এখনই তো চাপের চোটে অনেক খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে। এখন তো দেখি আমার খোঁজেই অনেকে বেরিয়ে পড়েছেন—তারই ঠেলায় প্রাণ যায়!

সেদিন এক বড়লোক বন্ধু এসে বললেন, ভাই, এই হাজার দশেক টাকার নোটটা তোমার মারফৎ ভাঙাতে চাই, এ উপকারটা তোমাকে করতেই হবে, তোমাকেও কিছু দোব।

আমি বললুম, মাথা খারাপ! আমি কি ক'রে ভাঙাব?

তিনি বললেন, কেন, তুমি লিখবে যে তোমার শ্বশুর মশাই মারা যাবার সময় তোমায় এ টাকা দিয়ে গেছেন!

সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে আমি ব'লে উঠলুম, তুমি ক্ষেপেছ? এই জামাইকে ওইটাকা যৌতুক হিসেবে দিয়েছেন শুনলে লোকে তাঁর নাম নিয়ে খামকা একটা বেইজ্জতি করবে, তা ছাড়া ব্যাঙ্কও বিশ্বাস করবে না। তারা গোল্ড-স্ট্যাণ্ডার্ড নিয়ে মাথা খাটায়, আর আমার হালচাল দেখে একটা জামাইয়ের স্ট্যাণ্ডার্ড ঠিক করতে পারবে না? আমায় রেহাই দাও দাদা। আমার পিতৃকুল, শ্বশুরকুল কোন দিক থেকে ওসব পাবার সম্ভাবনা নেই, সবাই ধ'রে ফেলবে, আমায় ক্ষেমা দাও ভাই। শহরে আরও অনেক বড় বড় লোকের শ্বশুর গত হয়েছে, তুমি তাঁদের একটু বল।



বন্ধুটি রাগ ক'রে চ'লে গেলেন। তা আমি কি করতে পারি বলুন? আমি মশাই গরীব কেরানী, দু-চার টাকা চুপিচাপি আপনারা ভালবেসে পান খেতে দেন নিতে পারি, কিন্তু দশ-বিশ

হাজার—ওরে বাবা! ওতে নেই। তাও ভরসা পেতুম, যদি যুদ্ধের বাজারে একটা ব্যবসা-ট্যাবসা ফেঁদে ফেলতে পারতুম।

তারপর মজা দেখুন, এখন ইনি আমায় লাভ দেবেন বলছেন, অথচ এক বছর আগে পেঁচির বিয়ের সময় শ পাঁচেক টাকা ধার চেয়েছিলুম, তখন বললেন, কোথায় পাব ভাই? 'এখন কোথায় এসব থোবার জায়গা পাই' ভেবে আকুল হচ্ছেন!

আশ্চর্যের ব্যাপার, টাকা আছে, কিন্তু কি ক'রে টাকা পাওয়া গেল তা বলবার জো নেই!

আমার তো ধারণা হয়েছিল, অনেকে যোগ-বলে টাকা পেয়েছেন; কিন্তু আদালতে তো যোগকে বিশ্বাস করবে না—সবই বিয়োগ ক'রে দেবে।

সেই খানেই তো ঝঞ্ঝাট! তাতেই গোল উঠেছে, চড়চড় ক'রে অনেকের ব্লাডপ্রেশার বেড়ে যাচ্ছে, বিদিকিচ্ছিরি সব কাণ্ড!

আমাদের পাশের বাড়িতেই হয়েছে।

ভদ্রলোক পোঁটলা বেঁধে জন আষ্টেক লোকের টিকিট কেটে মধুপুরে হাওয়া খেতে যাবেন ঠিক করেছিলেন। মনে করুন, নিচে দুখানা ঘোড়ার গাড়িতে মাল উঠেছে, এমন সময় খবর এল কৈফিয়ৎ ছাড়া বড় বড় নোট ভাঙান যাবে না।

ব্যাস্! সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির ছাদ থেকে মাল-পত্তর আবার বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। হাওয়া খাওয়ার জন্যে আর তাঁকে বাইরে যেতে হ'ল না, ঘরের ভেতরেই এখন তাঁকে তিন জন হাওয়া করছে।

হাসব, না, কাঁদব—ভেবে পাই না। দেখে শুনে ভাবি, বেশ আছি। নিজের কোন কিছু করতে না-পারার ক্ষোভ অপরের

লোভের শাস্তি দেখে ভারি তৃপ্ত হচ্ছিল। তাই মনের আনন্দে সেদিন সদর-দরজায় খিল না লাগিয়েই শুয়ে পড়লুম।

ব্যাস্! সকালে উঠেই দেখি, বাসন-পত্তর সব সাফ্!

মানে, চোরেরাও তো চালাক! তারা তো এখন চট্ ক'রে আজেবাজে বড়লোকের বাড়িতে চুরি করতে যাবে না! সেখানে তো নোটের তাড়া সাজানো, তার চেয়ে আমার বাড়ির বাসন-পত্তরই ভাল, যেহেতু ফুটো না হ'লে আর সেগুলো অচল হবে না। অতএব তাই নাও। আমি এখন করি কি, বলতে পারেন?

অপরের নাচ দেখতে গিয়ে এখন যে নিজে ভালুক-নাচ নাচছি। ওদিকে বড় বড় নোট নিয়ে মাথা ফাটাফাটি লাগল, আর এদিকে আমার ন'টে শাকটি মুড়োলো।

এখন আপনাদের পরমেশ্বর আমার একটা হাড়-জুড়োনোর বন্দোবস্ত করলেই, আমি ঝঞ্চাটের হাত থেকে বাঁচি!





সংসারের সং

আমি তো মশাই, প্রায় পাগল হয়ে এলুম—ঝি, চাকর আর বামুন নিয়ে যে-ঝঞ্ঝাট প্রতিদিন পোয়াতে হচ্ছে, তা যদি আপনাদের হ'ত, তা হ'লে আপনারা এ্যাদ্দিনে হয় কাশী কিংবা কাশ্মীরে গিয়ে ব'সে থাকতেন।

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে এঁরা তো সবাই মিলিটারিতে চ'লে গিয়েছিলেন, তখন তো এঁদের টিকি দেখা যায় নি, তারপর যখন ফিরে এলেন তখন থেকে যে দর বাড়িয়েছেন, তাতে তো সংসারে যুদ্ধ বেধে যাবার উপক্রম হয়েছে দেখছি।

ঝি, চাকর, বামুন—একটা না একটা প্রায় সব বাড়িতেই দরকার হয়, আমাদের আবার একান্নবর্তী পরিবারে যেখানে একশো একান্ন জন থাকেন, তাঁদের তো এই জীবগুলি না থাকলেই অচল; কিন্তু এঁদের ঠেলায় যে আমার জিব বেরিয়ে পড়বার উপক্রম হ'ল। ওঃ! ঝি, চাকর, বামুন নিয়ে যে এত ঝঞ্ঝাটে পড়তে হবে, তা

কস্মিনকালেও কখনও ভাবতে পারি নি—এদের সমস্যা কৃষক-প্রজা-মজুর-রাজের চেয়েও কঠিন।

আপনারা হয়তো বলবেন, তোমার ঝি চাকর বামুন রাখা কেন? অত বাবুয়ানির দরকার কি? আমিও তো তাই বলি, তা গিন্নীদের সব এই কথাটা বোঝাতে পারেন কি? নেহাৎ দায়ে না পড়লে এই বাজারে কেউ সদাব্রত খোলে!

আমার তো বাড়িতে মেয়েদের অভিযোগ শুনে শুনে কান প'চে গেল—আর কত হাঁড়ি ঠেলব? সবাই বামুন পাচ্ছে আর তুমি পাও না? দেখুন দেখি, আজকাল কি চট্‌ ক'রে এসব পাওয়া যায়? তার ওপর আবার আমার বাড়ি—এমনই একটা বামুন আনলে চলবে না, সে সত্যি বামুন কি না খোঁজ নাও, গায়ত্রীর মন্তর মুখস্থ আছে কি না দেখ, ইত্যাদি হাজার বায়নাক্কা।

আচ্ছা, আমি সত্যি-মিথ্যে যাচাই করি কোথায় বলুন তো? কলকাতা শহরের বামুন, সে হয়তো আগে নাপিতের ব্যবসা করত, তারপর বামুনের চাহিদা দেখে হয়তো বাজার থেকে দু' পয়সার পৈতে কিনে উল্টো দিকেই গলায় লাগিয়ে ঘুরছে, আমি তার সঠিক খোঁজ নিই কি ক'রে? আমার নিজের অত বায়নাক্কা নেই। যে রাঁধতে পারে সেই বামুন, কিন্তু আমার বাড়ির ধরণই আলাদা। সতেরো জায়গায় খোঁজ নিয়ে, কুষ্ঠি মিলিয়ে তবে তাঁকে আমার গুষ্টির রান্না করতে দেওয়া হবে।

তেমনই ভোগান্তি হয়ও। এক বচ্ছর খোঁজাখুঁজির পর হয়তো একটি ভরদ্বাজ-গোত্তর মিলল—তেমনই তাঁর বায়নাক্কা! আঠার টাকা মাইনে, বছরে ছ'খানা কাপড়, তিনখানা গামছা, এক জোড়া

জুতো, রোজ জলখাবারের চারটে ক'রে পয়সা, আধপো সরষের তেল, সকাল বিকেল চা, কাপড়-কাচা সাবান, নয় ধোপার পয়সা ইত্যাদি। দয়া ক'রে ফুলেল তেল আর দামী এসেন্স-সাবানটা এখনও চাইতে শুরু করে নি এই যা রক্ষে! মানে—তাঁর যা দাবী তা একেবারে জামাই-ষষ্ঠীর ফর্দ! বাপ রে বাপ!—এই ক'রে ঠাকুর এলেন।

সরস্বতী-ঠাকুর এলে ছেলেরা যে ভাবে যত্ন করে, তার চেয়ে বেশি আদর ক'রে এঁকে রাখতে হবে। সকাল আটটার আগে তিনি রান্নাঘরে পদার্পণ করবেন না, রেশনের করনকশ্মি-করা মাল তাঁর হাতে আদ্ধেক ঘাল হবে, বেলা বারোটার সময় তিনি নিজের ভাত বেড়ে খেয়ে-দেয়ে বাসায় চ'লে যাবেন, আবার সন্ধ্যে সাতটার আগে তিনি দেখা দেবেন না, যা রাঁধবেন তা তিনি ছাড়া কারুর মুখে দেবার জো থাকবে না, মেয়েরা সেই সমান রান্নাঘরে থাকবেন আর ব'কে ব'কে মাথা গরম করবেন, ঠাকুর শুধু উপকারের মধ্যে হাঁড়িটি উনুনে ওঠানো নামানো এবং মেয়েদের পরিচালনায় রান্নার মসলা তরকারিতে দিয়ে নিজের খুশিমত একটু হাতাখুন্তি নেড়ে চ'লে যাবেন—এই কাজ। হেঁসেল ছোঁবার জো নেই, তা হ'লেই তাঁর খাওয়া মাটি! তবু মেয়েরা বলবেন না যে, ঠাকুরের আর দরকার নেই, আমরাই রেঁধে-বেড়ে নোব।

অথচ মাসের মধ্যে ছ'দিন তাঁর জ্বর, ন'দিন তাঁর পেটের অসুখের কামাই লেগেই আছে। বকবার জো নেই, তা হ'লেই তো চলল। বড় বড় মেজাজওয়ালা বাবুদের দেখছি কাহিল হয়ে এসেছেন। কারণ, পাচ্ছেন কোথায়?

তার ওপর আপনাদের জ্বালায় তো লোক রাখবারও উপায় নেই। আমার সাত রাজার ধন মাণিকটিকে যদি আপনারা পঞ্চাশ দফা পঁচিশ টাকা মাইনে দোব, ভাল লাঞ্চ দোব, ডিনার দোব ব'লে রোজ আড়ালে লোভ দেখান, তা হ'লে আমার কাছে সে থাকেই বা কি ক'রে? আপনারাই তো দফা খেলেন। আপনাদের ঈশ্বরের কৃপায় যুদ্ধের বাজারে বুদ্ধির জোরে দু-পয়সা হয়েছে ব'লে শুধু শুধু গরীবের সংসারে ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে কি লাভটা হচ্ছে বলতে পারেন?

যাক, বামুনের পর্ব গেল, এল চাকর—বেতন বারো টাকা, তা ছাড়া আদর সব তো আছেই। তিন বালতি জল তুলতে তিনি হাঁপাবেন, সারা দুপুর ঘুমুবেন, বাজার করার সময় বাবু সঙ্গে গেলে সারাদিন গোসাভরে ব'সে থাকবেন, যেখান থেকে যা মালপত্তর কিনে আনবেন তা যত দামেরই হোক তার ওপর কথা-বলার কারুর কণ্ট্রোল থাকবে না, সেইটেই ধ্রুব-সত্য ব'লে মানতে হবে, রাত্তিরে সদর-দরজা বন্ধ করতে ভুলে যাবেন এবং চোরে সর্বস্ব নিয়ে গেলেও তিনি দায়ী থাকবেন না, জিনিসপত্র যথাযথ স্থানে আস্ত থাকে সেটা বরদাস্ত করবেন না, সন্ধ্যে থেকে ঘুমুবেন, দুপুরেও তাই, বকলে তক্ষুনি মাইনেপত্তর নিয়ে চ'লে যাবেন এবং যে কদিন দয়া ক'রে থাকবেন, সে কদিন এত স্বল্প আহার করবেন যে স্বয়ং সরকার সে ব্যবস্থা না-করাতে আমাকে তার বন্দোবস্ত করবার জন্যে দু-চারজন সৎ-ব্যবসায়ীর শরণাপন্ন হতে হবে।

দিব্যি আছি! এর পর আছেন দুটি রাতদিনের ঝি—একটি

মেজোবাবুর আর একটি সেজোবাবুর, তাঁদের চীৎকারে আর বউমাদের প্রতিবাদে বাড়ীতে একমুহূর্ত যদি টিকতে পারেন! শহরে ১৪৪ ধারা ও সান্ধ্য-আইন থাকলেও, মনে করুন, মাঝে মাঝে সদলবলে সামনের রকে আমরা বেরিয়ে পড়েছি। এর ওপর যখন আমার গিন্নী সালিশী করতে নামেন, তখন মনে হয় যে, অ্যাটম্-বম্ না ফেললে এ ঝঞ্ঝাটের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই।

মশাই, নীচে একটা বড় তক্তাপোশে শোবার জায়গা ক'রে দিয়েছি, রাত দেড়টার সময় হৈ-হৈ কাণ্ড। কি, ব্যাপার কি ?— না, মেজোবাবুর ঝি পদী, সেজোবাবুর ঝি ক্ষুদীকে ঘুমের ঘোরে ল্যাং মেরেছে! তার ফলে ক্ষুদী ক্ষেপে গিয়ে দুমদুম ক'রে তার পায়ে দুটো কিল বসিয়ে দিয়েছে, পদী চীৎকার শুরু করেছে। তখুনি উভয়ের মনিব নীচে নেমে ঝিয়েদের সঙ্গে তর্কাতর্কি শুরু ক'রে দিয়েছেন, ঘুমের দফা গয়া, আমি গিয়েও কাউকে থামাতে পারি না, সে এক বিদিকিচ্ছিরি কাণ্ড!

ইনি বলেন, আমার ঝিয়ের একটা আলাদা ঘর দাও। উনি বলেন, ওঁরও আলাদা ব্যবস্থা করা চাই। এর কি উপায় করি বলুন তো? এঁদের এক একটা ঘর দিতে হ'লে তো আমায় নিজের ঘর ছেড়ে দিয়ে ছাতে ম্যারাপ বেঁধে শুয়ে থাকতে হয়, তা না হ'লে এ বাজারে বোধ হয় ঝি-চাকর রাখা অসম্ভব।

নিরুপায় হয়ে শেষে তক্তাপোশে একটা খড়ির দাগ টেনে দিয়ে ব'লে দিলুম, অত ঝগড়াঝাঁটির দরকার নেই; কেউ এই সীমানার বাইরে ঠ্যাং সরাবে না।

তাতেও কি ঝঞ্ঝাটের রেহাই আছে? পরশু রাত দুটোর সময় আমার দরজায় দমাদ্দম আওয়াজ। ধড়মড় ক'রে উঠে জিজ্ঞাসা করলুম, কে?

আওয়াজ এল পদীর।

গিন্নী উঠে বাইরে গেলেন, পদী তাঁকে ডাকছে নীচে। কারণ?—ক্ষুদী নাকি খড়ির দাগ পেরিয়ে আড়াই হাত বেঁকে পদীর বর্ডার-লাইন ক্রস্ ক'রে গেছে। সে চীৎকার ক'রে বলছে, বড়মা, তুমি দেখবে এস ক্ষুদীর কাণ্ড! বাবু যা দাগ দিয়ে গেছে তার থেকে কোথায় স'রে এসেছে, দেখবে এস। আমি যদি এখুনি মারি, তা হ'লে আমার দোষ? না বাপু, তুমি একবার বাবুকে ডাক, নিজে এসে তিনি 'নাইন' দেখে যান।

গিন্নী ঝাঁঝিয়ে ব'লে উঠলেন, বকিস নি। বাবু এখন ঝিয়েদের শোয়া দেখতে যাবে? দূর হ। কাল সকালে সে আমি দেখব 'খন।

পদী রাগতভাবে দুমদুম পদবিক্ষেপে প্রস্থান করলে গিন্নীর সব ঝাল এসে পড়ল আমার ওপর, তোমার যেমন আক্কেল, কোথাও কিছু নেই, উনি খড়ি দিয়ে দাগ কেটে এলেন, একটা যদি কিছু গোছ-বন্দোবস্ত থাকে! চিরটাকাল হাড় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেলে।

আচ্ছা, আমি কি করব বলতে পারেন? ঝি-চাকর নিজের নিজের জায়গায় শুয়ে আছে, তারা যদি লাথালাথি শুরু করে, তা হ'লে কি সেটাও আমায় দেখতে হবে? তা হ'লে তো আপিস থেকে সন্ধ্যাবেলায় ফিরে এদের সব ঠ্যাং ধ'রে ব'সে থাকতে হয়! কি আপদ বুঝুন!

এদের খাওয়া পছন্দ নয়, কাজ পছন্দ নয়, শোওয়া পছন্দ নয়, মাইনে পছন্দ নয়—এদের যে কি হ'লে সব-কিছু পছন্দ হয় তা তো বুঝে উঠতে পারি না।

আপিসে কর্তাদের এত ভাল বন্দোবস্ত ক'রে আমাদের মত কেরানীদের রাখতে হ'লে বোধ হয় আপিস তুলে দিতেন, কিন্তু দিনকাল যা পড়েছে এবং লোকজনকে নিয়ে যে ঝঞ্ঝাট আমায় পোয়াতে হচ্ছে, তাতে আমায় না পটল তুলতে হয়, তাই ভাবছি।

জিনিস কেনার দিক্‌দারি

শুনেছেন ?—ক্ষেন্তি, খেঁদি আর পটকা তিনটেই নীচু ক্লাসে বেশ পটপট ক'রে পাশ ক'রে গেছে। কিন্তু ফলে হয়েছে কি ? এদের জ্বালায় যে ভাল ক'রে একটু পাশ ফিরে ঘুমুব তার জো নেই।

দিনরাত তাগাদা—আমাদের বই কিনে দাও, সব্বার বই কেনা হয়ে গেছে, আমাদেরই কেনা হ'ল না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

যদি বলি, ওরে বাবা থাম্। মাইনে পাই, তবে তো দোব ? তা কে বা শোনে কার কথা। আর তেমনিই অবুঝ ওদের মা। এরা যদি একগুণ বলে, তিনি পাঁচগুণ ব'কে যাবেন।

কেন ওদের ক'খানা বই কেনবার আর তোমার পয়সা নেই ? জান তো, ওরা এইবার ক্লাসে উঠবে, আগে থেকে একটা তার হিসেব থাকে না ?

বুঝুন। গাধাবোট টেনে নিয়ে চলেছি, এর ওপর যদি আবার ডিঙ্গি-নৌকাগুলোকে একসঙ্গে টানতে না পারি, তা হ'লেও সে আমার দোষ।



আমি বে-হিসেবী! কিন্তু এটুকু বোঝেন না যে, আর হিসেবের কিছু নেই, বন্ধু-বান্ধবের কাছে ধার চাইতে শুরু করেছি, তাঁরা আমাকে দেখে এখন পালাতে শুরু করেছেন। কিন্তু কি বলব বলুন? তর্ক করা মানে তো আরও হাঙ্গামা বাধানো।

স্বরটা বেশ নরম ক'রেই বললুম, আহা, বই নয় দুদিন পরেই আসবে, এখন তো ছুটি আছে, এক্ষুনি তো আর পড়তে বসছে না?

তার স-জোর উত্তর এল, হ্যাঁ, পড়বে। ইস্কুল খুললে ওরা পড়বার সময় পায়? এখন থেকে পড়লে তবে তো ওরা একটু পড়াশোনা এগিয়ে রাখতে পারে।

শুনলেন? ইস্কুল খুললে ছেলেপুলেদের পড়াশোনা হয় না, ইস্কুল বন্ধ থাকলে তবু কিছু হয়! তবু ইস্কুল যেতে হবে, আর আমি বেটা মাইনে, পাংখা-ফী, কিৎ-কিৎ-ফী এইসব বছর-ভোর গুণে যাব! কি ঝঞ্ঝাট বলুন তো?

আমি জানি আমার ছেলেপুলের কিচ্ছু হবে না। কারণ, তাদের বাপের যে কিচ্ছু হয় নি। কিন্তু আমার গিন্নীর ধারণা, ঠিক তার উল্টো। তাঁর কল্পনায় ছেলেরা আইনস্টাইন, আর মেয়েরা ম্যাডাম কুরী হয়ে ব'সে আছে। অথচ তাদের রিপোর্টে লিখেছে—অঙ্কয় এগারো, বিজ্ঞানে জিরো।

এসব বোঝাই কাকে? বোঝাতে গেলেই তো আমার ওপর চাপ পড়বে উল্টে; কেন, নিজের ছেলেপুলেদের সকাল-বিকেল একটু দেখতে পার না? সব্বাই দেখে।

সব্বাই যে এত রকম বায়নাক্কা সামলে কি ক'রে এত দেখে, সেটা তো আমার মাথায় আজ পর্যন্ত ঢুকল না মশাই! আপনারা সত্যিই মহাপুরুষ লোক। দয়া ক'রে খামে একটু পায়ের ধুলো ভ'রে পাঠিয়ে দেবেন, তাই ঘরের মেঝেয় ছড়িয়ে তার ওপর একটু গড়াগড়ি খাব। উঃ, জ্বালাতন!

যাক্‌গে, ধুত্তোর ব'লে গোটা বারো টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম এদের বই কিনতে, কিন্তু দোকানে গিয়ে দেখলুম সব্বাই অন্তত একসঙ্গে বই কিনতে বেরিয়ে পড়েছেন বটে। উঃ, কী ভীড়!

মনে হ'ল, সমস্ত বাংলা দেশ একসঙ্গে পণ্ডিত হবার সঙ্কল্প ক'রে বসেছে। বই যে কিনতে পারব তার ভরসা নেই!

কলেজ স্ট্রীট থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত, বেলা সাড়ে দশটা থেকে রাত সাড়ে আটটা অবধি ঘুরলে তবে যদি কিছু পাওয়া যায়—তাও অর্ধেক বই ছাপা নেই, নয় কিছু ছাপা হচ্ছে, এগ্‌জামিনের কাছ-বরাবর বেরুবে! দু-চারখানা যাও বা ছিল, তাও আবার আমার মাথা খেতে অপর লোকের বাবারা কিনে নিয়ে গেছে। আমার মাথায় বজ্রাঘাত আর কি!

আপিস থেকে খেঁদী পটকার বই কেনবার জন্যে একদিন ছুটি নিলুম মশাই, কিন্তু তাও সব পেলুম না, মাঝ থেকে বইয়ের দোকানের কয়েকটি বাবুর মুখ-ঝামটা খেয়ে মলুম।

ছোট ক্লাসের বই অর্ধেক দোকানে চাওয়া যেন অপরাধ! যেন যারা চাইছে তারাও ছোটলোক! কি মুশকিল বলুন তো?



একজন খিঁচিয়ে উঠলেন, হবে না, হবে না মশাই. এখানে ওসব বইয়ের জন্যে এসেছেন কেন? এখানে পাঠশালার বই পাওয়া যায় না।

যাক, বেরিয়ে প'ড়ে পাশের দোকানে গেলুম। সেখানে দেখি, দু-একজন নীচু ক্লাসের বই কিনেছেন। দেখে ভরসা হ'ল, তাই ভিড়ের ভিতর থেকে অপরাধের মধ্যে দোকানীর দৃষ্টি আকর্ষণের অভিপ্রায়ে একটু জোরে জিজ্ঞাসা করেছি. হ্যাঁ মশাই, পঞ্চম মানের গোবর চক্রবর্তী প্রণীত স্বাস্থ্যতত্ত্ব আছে।

তিনবার ডেকে তিনি সাড়া দিলেন না, আর আমিও সামনে মাঝে মাঝে ফাঁক দিয়ে হ্যাঁ মশাই, গোবর চক্রবর্তীর স্বাস্থ্যতত্ত্ব আছে?—আউড়ে যেতে লাগলুম।

অতবার বলাতে তিনি দয়া ক'রে একবার আমার মুখের দিকে এমনভাবে চাইলেন যে, পেটরোগা লোক হ'লে আমার স্বাস্থ্য তখুনি খারাপ হবার সম্ভাবনা ছিল।

আমি আকৃতি দেখেই সুরটা নরম ক'রে তাঁর চোখের দিকে চোখ রেখে আবার একবার গোবর চক্রবর্তীর খোঁজ নিতেই তিনি হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন, চেঁচাবেন না।

তবু বলতে পারলেন না, বইটা আছে কি নেই। একটু রাগ

হ'ল, বললুম, সাধ ক'রে কি চেঁচাই মশাই? আপনি যে কোন কথাই বলছেন না!

তিনি আরও ক্ষেপে গেলেন, ব'লে উঠলেন, সাড়া দোব কি? আমি দাঁড়িয়ে খেলা করছি? দেখছেন, আর পাঁচজনের বই দেখছি। আপনি যেন একেবারে ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছেন! অত তাড়া থাকে তো অপর দোকানে যান। খদ্দের যারা আগে এসেছে তাদের তো আগে দোব, না কি?

নিন। আমি যেন সব্বার আগেই সেটা আমাকে দিতে বলেছি?

তবু তিনি কৃপা ক'রে একবারটিও বললেন না যে, বইখানা তাঁর দোকানে কোনমতে পাওয়া যাবে কি না! দেখলুম, ছ' আনার বই কিনতে এসে ছ' শো কথার সৃষ্টি হবে। বিরক্ত হয়ে দোকান থেকে চ'লে যেতে যাব, ঠিক এমনই সময় একটি তরুণীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, শিশুদের নব-ধারাপাত পাওয়া যাবে?

দোকানী তড়িৎস্পৃষ্টের মত লাফিয়ে ব'লে উঠল, আজ্ঞে যাবে। গোবিন্দ, একখানা নব-ধারাপাত আগে দাও। আমার সঙ্গে এতক্ষণ যে দোকানী কথা কচ্ছিল, এ যেন সে লোকই নয়, তার কণ্ঠে মধুর স্বর, চোখের চাহনি—আহা, সেও কি চমৎকার!

গোবিন্দ দূরে একটা মইয়ের উপর চ'ড়ে কার বই বছাছিল, সে পিছন ফিরে না দেখেই উত্তর দিলে, একটু দাঁড়াতে হবে।



আর যায় কোথা? দোকানী চীৎকার ক'রে ব'লে উঠলেন, ওসব রেখে দাও। আগে নব-ধারাপাত নিয়ে এস। ব'লেই একেবারে গলার স্বরটা, তাঁর গলায় যতটা মিষ্টি হয়, সেইভাবে তরুণীর দিকে চেয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, আর কি দেব বলুন?

তরুণীটি মৃদু হেসে বললেন, আর কিছু নয়, কত দাম? তিনি বললেন, আজ্ঞে ছ পয়সা। বলতেই তরুণীটি একখানি দশ টাকার নোট বার ক'রে তাঁর হাতে দিলেন। তিনি তখন তার ভাঙানি কি ক'রে দেবেন. তাঁরই আয়োজনে টেবিলের উপর ক্যাশবাক্স উপুড় ক'রে ফেলেছেন।

আমার আর সেখানে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছা হ'ল না, মনে হ'ল. ছেলেমেয়েরা পারে নিজেরা এসে বই কিনে নিক, আমার আর দরকার নেই।

আপনারা হয়তো বলবেন; মেয়েদের ওপর তোমার অকারণ এ রকম হিংসে কেন?

তার উত্তরে আমি বলব যে, হিংসে আমার কারুর ওপর নেই মশায়, সামান্য একটু মাছ-মাংসের ওপর ছিল, তাও তিন

হ'ল, বললুম, সাধ ক'রে কি চেঁচাই মশাই? আপনি যে কোন কথাই বলছেন না!

তিনি আরও ক্ষেপে গেলেন, ব'লে উঠলেন, সাড়া দোব কি? আমি দাঁড়িয়ে খেলা করছি? দেখছেন, আর পাঁচজনের বই দেখছি। আপনি যেন একেবারে ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছেন! অত তাড়া থাকে তো অপর দোকানে যান। খদ্দের যারা আগে এসেছে তাদের তো আগে দোব, না কি?

নিন। আমি যেন সব্বার আগেই সেটা আমাকে দিতে বলেছি?

তবু তিনি কৃপা ক'রে একবারটিও বললেন না যে, বইখানা তাঁর দোকানে কোনমতে পাওয়া যাবে কি না! দেখলুম, ছ' আনার বই কিনতে এসে ছ' শো কথার সৃষ্টি হবে। বিরক্ত হয়ে দোকান থেকে চ'লে যেতে যাব, ঠিক এমনই সময় একটি তরুণীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, শিশুদের নব-ধারাপাত পাওয়া যাবে?

দোকানী তড়িৎস্পৃষ্টের মত লাফিয়ে ব'লে উঠল, আজ্ঞে যাবে। গোবিন্দ, একখানা নব-ধারাপাত আগে দাও। আমার সঙ্গে এতক্ষণ যে দোকানী কথা কচ্ছিল, এ যেন সে লোকই নয়, তার কণ্ঠে মধুর সুর, চোখের চাহনি—আহা, সেও কি চমৎকার!

গোবিন্দ দূরে একটা মইয়ের উপর চ'ড়ে কার বই বছাছিল, সে পিছন ফিরে না দেখেই উত্তর দিলে, একটু দাঁড়াতে হবে।



আর যায় কোথা? দোকানী চীৎকার ক'রে ব'লে উঠলেন, ওসব রেখে দাও। আগে নব-ধারাপাত নিয়ে এস। ব'লেই একেবারে গলার স্বরটা, তাঁর গলায় যতটা মিষ্টি হয়, সেইভাবে তরুণীর দিকে চেয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, আর কি দেব বলুন?

তরুণীটি মৃদু হেসে বললেন, আর কিছু নয়, কত দাম? তিনি বললেন, আজ্ঞে ছ পয়সা। বলতেই তরুণীটি একখানি দশ টাকার নোট বার ক'রে তাঁর হাতে দিলেন। তিনি তখন তার ভাঙানি কি ক'রে দেবেন. তাঁরই আয়োজনে ·টেবিলের উপর ক্যাশবাক্স উপুড় ক'রে ফেলেছেন।

আমার আর সেখানে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছা হ'ল না, মনে হ'ল. ছেলেমেয়েরা পারে নিজেরা এসে বই কিনে নিক, আমার আর দরকার নেই।

আপনারা হয়তো বলবেন; মেয়েদের ওপর তোমার অকারণ এ রকম হিংসে কেন?

তার উত্তরে আমি বলব যে, হিংসে আমার কারুর ওপর নেই মশায়, সামান্য একটু মাছ-মাংসের ওপর ছিল, তাও তিন

টাকা চার টাকা সের হওয়ার পর থেকে ঘুচে গেছে, এখন আমি সম্পূর্ণ নিরামিষ ও অহিংস। তবে কি জানেন. এ-যুগে মেয়েদের যখন সমান অধিকার. তখন আমাদের অধিকারে হাত পড়লে একটু লাগে বইকি।

এই দেখুন না কেন, বছর দুয়েক আগে একটা কাপড়ের দোকানে ঢুকে প্রায় যাট-বাষট্টি টাকার কাপড় কিনতে গেলুম, পছন্দমত কাপড় দিতে দোকানীর যেন বিরক্তি। দুটো গাঁটরি নামিয়ে দুখানার দর জিজ্ঞেস করেছি, তাতে বলে, আগে বাছুন না, তারপর দর বলব'খন। কিছুতেই তিনি বুঝবেন না যে, দরের সঙ্গে পছন্দর সম্পর্কটা কতখানি। তা নয়, বোঝেন সবই, কিন্তু তালমাফিক আমার পছন্দর ওপর তবে তো কোপ দেবেন, এই আর কি।

যাই হোক, অতি বিরক্তির সঙ্গে তিনি অন্যমনস্কভাবে আমাকে কাপড় দেখাতে লাগলেন, ঠিক এমনই সময় একটি মেয়ে এসে দোকানে ঢুকতে দোকান শুদ্ধু তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়লেন। কি চাই ? না, সিল্কের ফিতে।

তিনি দোকানের সমস্ত সিল্কের ফিতে আধ ঘণ্টা ধ'রে পরীক্ষা ক'রে আনা ছয়েক দিয়ে এক গজ নিয়ে গেলেন। আমি হাঁ ক'রে ব'সে, কারণ আমাকে দেখাবার জন্যে আর আগ্রহ কার? আধ ঘণ্টা পরে আমার জিনিস-বিক্রেতা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে এসে আমার কাছে পুনরায় ব'সে জিজ্ঞাসা করলেন, এইবার বলুন, আপনার কি চাই ?

সেই থেকে আমি জানি যে, কাপড়ের দোকানে আমাদের না

ঢোকাই ভাল, কিন্তু বইয়ের দোকানেও দেখি তাই। শেষে বিরক্ত হয়ে চ'লে গেলুম এক মনিহারির দোকানে। মেজবউমা তাঁর খোকার জন্যে একটা মোজা কিনে নিয়ে যেতে বলেছিলেন, তাই কিনে নিয়েই বাড়ি ফেরবার ইচ্ছে হ'ল। গেলুম একটি দোকানে। দেখলুম, ভিড় নেই। মনটা বেশ খুশি হ'ল, কিন্তু আমার বরাত তো! সেখানেও ঠায় পনেরো মিনিট দাঁড়িয়ে। দোকানী তাঁর কোন আলাপী লোকের সঙ্গে কথা কইছেন, খদ্দের যে একজন দাঁড়িয়ে, সে হুঁশই নেই। বহুক্ষণ পরে পাশের দিকে একটু ঘাড় ফিরিয়ে তিনি দয়া ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, কি চাই?

বললুম, একজোড়া ছোট ছেলের মোজা হবে?

ছোট ছেলের মোজা শুনে তিনি যেন নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে নেহাত খদ্দেরকে ফিরিয়ে দেবেন এই ভাব দেখিয়ে একটি রদ্দি মাল আমার হাতে দিলেন।

অপরাধের মধ্যে আমি বলেছি, এঃ, এগুলো যে বড্ড লালচে হয়ে গেছে!

বলতে না বলতে সেগুলি বাক্স-বন্দী হয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল, যেখানে ভাল পান দেখুন। পুনরায় তিনি তাঁর পরিচিত ব্যক্তিটির সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলেন।

আমি তো হতভম্ব! ভাবলুম, একই দোকানীর ভায়রাভাই শহরের সর্বত্র দোকান খুলে ব'সে আছে, নিজের দেশের লোকের কাছ থেকে রীতিমত পয়সা খরচ ক'রে নির্বিবাদে জিনিস কিনব তারও জো নেই—সেখানেও দেখুন, কি ঝঞ্ঝাট!

যুগের তাড়া



—তাড়ার যুগ

এ যুগে জন্মগ্রহণ করাটাই বোধ হয় আমার ভুল হয়ে গেছে, কারণ কিছুতেই আমি সামলে উঠতে পারছি না। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে শুনলুম, সবাই বলছেন যে, যুগ এগিয়ে চলেছে আর আমি থপ্‌থপ্‌ ক'রে কচ্ছপের মত চলেছি ব'লেই আমার নাকি আর ঝঞ্ঝাটের শেষ নেই! দোষ যুগের নয়, আমার। এ যুগ ঘোড়দৌড়ের যুগ, যারাই লম্বা ঠ্যাং ফেলে ছুটেছে, তাদেরই শেষ পর্যন্ত জিত।

আচ্ছা, আর কত ছুটব বলতে পারেন? জীবন-যাত্রা কায়ক্লেশে চালাবার জন্যে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত তো দৌড়-ঝাঁপের অন্ত নেই, এর ওপরও গতি বাড়াতে গেলে তো গেছি। ধীরে-সুস্থে মাথা ঠাণ্ডা ক'রে চলা কি একেবারে সংসার থেকে উঠে গেল?

দেখছি, ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত দাঁড়াচ্ছে তাই। মানে, আমি যদি একটু ধীরে-সুস্থে চলতে চাই, অমনই দেখি আমার আশপাশের লোকেরা তার চার গুণ জোরে চলতে শুরু করে।

বাজারে এক টাকা পাঁচ সিকে ক'রে কুঁচো চিংড়ির সের হাঁকলে। টেনে-বুনে প্রায় চৌদ্দ আনায় নামিয়ে এনেছি, হঠাৎ এক বাবু দৌড়ে এসে পাঁচ সিকে ক'রে সের পাঁচেক চিংড়ি নিয়ে চ'লে গেলেন। থলি হাতে আমি ভ্যাবাগঙ্গারামের মত দাঁড়িয়ে, মেছোর মেজাজ গেলে বেঁকে, ফের দর করতে যেতেই সে খিঁচিয়ে ব'লে উঠল, বউনির সময় বেশি বকবেন না, বারোটা আন্দাজ আসবেন, যদি কিছু থাকে চৌদ্দ আনায় দোব'খন।

বুঝলুম, পয়সার দৌড় না থাকলে সাত-সকালে দৌড়ে এসেও বাজার করা চলে না।



রেশনের দোকান সাড়ে আটটায় খোলে, আমি এক ঘণ্টা আগে বেরিয়ে প'ড়ে ভাবলুম যে, আমিই বোধ হয় লাইনের গোড়ায় গিয়ে দাঁড়াব—ও হরি, সেখানে গিয়ে তো আমার চক্ষুস্থির! আমার আগে একান্নজন দাঁড়িয়ে, তার মধ্যে আবার কেউ কেউ দাঁতন করছেন। আমায় হন্তদন্ত হয়ে সেখানে হাজির হতে দেখেই, সবাই একটু ট্যারাভাবে দেখে নিয়ে মুখ টিপে হেসে উঠলেন। শুনলাম, সর্বাগ্রের ব্যক্তিটি ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে সেখানে খাড়া আছেন। তবু আপনারা বলেন যে, বাঙালীর ধৈর্য নেই, সাধনা নেই। হুঁঃ!

ট্রেনে চেপে বিদেশ যাব, গাড়ির সময়ের দু-ঘণ্টা আগে গিয়ে প্ল্যাট্‌ফরমের দরজায় রইলুম। যখন স্টেশনে গাড়ীটি ঢুকল, তখন তার ভেতর ঢোকে কার বাবার সাধ্যি! গাড়ি ভর্তি। শুনলুম এঁরা নাকি কৌশলে কি রকম তাক্‌তুক্ ক'রে লাইনের মধ্যিখানে গিয়ে আগে থেকে উঠে ব'সে আছেন। আমার আর অগত্যা যাওয়া হ'ল না।

ছুটির দিনে ভাবলুম একটু বায়োস্কোপে যাব, দিন তিনেক আগে টিকিট কিনে রাখি, কিন্তু সে সৌভাগ্য হ'ল না। শুনলুম আমি যাবার আগে ভাল ভাল সিটগুলো টিকিটবাবুদের ভাবের লোকেদের কাছে পাচার হয়ে গেছে, আসল দিনে দশ আনার টিকিট পাঁচ সিকে দিয়ে কেনা যেতে পারে।

দেখলুম এত লোকের সঙ্গে সত্যিই পাল্লা দেওয়া অসম্ভব। দুঃখের কথা বলব কি মশাই, একটি বিদিকিচ্ছিরি গোছের মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়ে কি রকম একটু সহানুভূতি জেগে উঠল, ভাবলুম, আহা, বেচারীর যদি আমার দ্বারা কোন উপকার হয়, কেউ এর ব্যথা হয়তো বোঝেনি; কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানলুম, আমার আগে তার দুঃখে ব্যথিত হয়ে একুশজন ইতিমধ্যে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়েছে, জনপাঁচেক আফিং খেয়ে হাসপাতালে শুযছে।

সবাই যে এত তাড়াতাড়ি সমস্ত কাজ কি ক'রে চুকিয়ে-বুকিয়ে ফেলছে, এ একটা আশ্চর্য ব্যাপার! তাই ঘরে বাইরে আমারও তাড়া খেতে খেতে প্রাণ বেরিয়ে যাবার উপক্রম। বন্ধুবান্ধবের কাছে দুঃখ নিবেদন করতে গেলুম, তাঁরা ব'লে উঠলেন, কি করবে

বল, এ যুগ তাড়ার যুগ, মোড়ার মত প'ড়ে থাকলে চোট খাবে বইকি।

সেটা কি আর আমিও মর্মে মর্মে বুঝছি না। তা না হ'লে দেখুন না ছেলেপুলেদের এ বছরের পুরোনো কেতাব আর পরের বছরে চলে না। সব নতুন চাই। ঘণ্টায় ঘণ্টায় মেয়েরা কাপড় বদলাচ্ছে, তা যোগানো চাই। কিন্তু কোথেকে এত করি ?

এই তো সেদিন পুঁটির বিয়ের সময় কতকগুলো ছাপা সিল্কের শাড়ি এনে দিলুম, তার দু-মাস গেল, না এসে বলে, ম্যাগো, ও কি আবার সব শাড়ি! এখন জর্জেট ছাড়া কোথাও কেউ বেরুতে পারে ?



আচ্ছা বাবা, জর্জেটই হবে। কিছু পয়সা জমিয়ে ধারধোর ক'রে, বহু পাতালপুরী ঘুরে পূজোর সময় তাই কিনে নিয়ে এলুম, মশাই, কিন্তু তার ফল হ'ল এই যে তার শাশুড়ী ঠাকরুণ ক্ষীরমোহনের থালাটা উজোড় ক'রে নিয়ে ঝিয়ের মারফৎ কাপড়খানি ফেরত দিয়ে ব'লে পাঠালেন, মিন্সের কি চোখ নেই ? আশপাশে পাঁচজন মেয়েছেলে কি প'রে বেড়াচ্ছে তাও কি দেখে নি ? আজকাল বেনারসী ছাড়া কেউ কিছু পরে ?

বুঝুন, মেয়েরা কে কি প'রে বেড়াচ্ছে আমি এখন তাই দেখে বেড়াই! তারপর ভাবছেন এতেও রক্ষে আছে ? যখনই বেনারসী নিয়ে আসব, তখনই হয়তো শুনব এখন আকাশী রঙের হাসিখুশী

শাড়ির রেওয়াজ হয়ে গেছে, তা ছাড়া আর কেউ কিছু পরছেই না।

বাড়িতে অবশ্য বেয়ান ঠাকরুণের কাপড় ফেরত পাঠানোটা কেউ সুচক্ষে দেখলেন না, কিন্তু তা হ'লেও মেয়েদের বৈঠকে ঠিক হয়ে গেল, আমার পছন্দটা বড় সেকেলে।

মোদ্দা কথা, আমি ফ্যাশান জানি না, সেইটে হ'ল আমার এযুগে সবচেয়ে বড় অপরাধ। গুষ্টিবর্গের রেশনের বন্দোবস্ত ক'রে আবার ফ্যাশান না জানলে আমি যে সংসারের পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য, এটা প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে। মানে, সবাই আমায় ঠেসান দিয়ে কথা শুনিয়ে যাবেন, আমি নির্বিকার বুদ্ধদেব হয়ে ব'সে থাকব, এই হ'লেই সংসারে ভাল হয় আর কি।

গিন্নী বলেন, সত্যি বাপু, তোমার ঠিক চোখ নেই।

এই পিত্তি-জ্বলুনি বচন শুনে আমিও চ'টে-ম'টে ব'লে উঠি, না, তা নেই, নাক আছে তো? একদিন তাই বরাবর সিধে রাস্তা দেখে ছু' চোখ যেদিকে যায়, সেই দিকে বেরিয়ে পড়ব। দেখুন দেখি আপদ!

আজকের জিনিস কালকেই পুরোনো হয়ে গেল?—এ আবার কোন্ দিশি কথা! তা নয়, সব কিছুতে যে তাড়া। চলতে হবে তাড়াতাড়ি ট্রামে উঠতে হবে পড়ি কি মরি ক'রে, মিটিঙে যেতে হবে দৌড়াদৌড়ি ক'রে, আসতে হবে হুড়োমুড়ি ক'রে লোকের পা মাড়িয়ে, নাড়িভুঁড়ি ছিটকিয়ে দিয়ে, বন্ধুত্ব হবে দু মিনিটে, পাঁচ মিনিটের মধ্যে আবার সে বন্ধুত্ব জন্মের মত ঘোচাতে হবে, সব বিষয়ে মত প্রকাশ করতে পাঁচ সেকেণ্ডের বেশি দেরি হবে না,

একখানা বড় বই পড়তে মিনিট পনেরোরও কম সময় লাগবে, চরকির মত একবার এখানে ওখানে অকারণে পাক খেতে হবে, তা না হ'লে কেউ স্মার্ট্ বলবে না, আজ যা পোষাক-আসাক কেনা হ'ল তিন দিন পরেই তা বাতিল করতে হবে, তা না হ'লেই পেছিয়ে গেলেন, আর সংসারে আপনার দাম নেই। এ কি মুশকিল বলুন তো ?

তার ফলে হচ্ছে কি, ছেলেদের আজ স্যাণ্ডাল কিনে দিলুম, কাল আনতে হবে গ্রিশিয়ান, পরশু নিউকাট, তরশু কাব্লে। তা না হ'লে তাঁরা বাইরে হাঁটতে পারবেন না, পায়ের লজ্জায় মাথা কাটা পড়বে। কি ঝঞ্ঝাট ভেবে দেখুন !

মাঝে মাঝে যখন পেরে উঠি না, তখন ভাবি, চীৎকার ক'রে ব'লে উঠি, ওরে, তোদের পায়ে কি আমি মাথা খুঁড়ে মরব ?

কিন্তু তা বললেই কি তারা শুনবে ভাবছেন ?—আমাকেই হয়তো মাড়িয়ে দিয়ে চ'লে যাবে।

ছেলেমেয়েদের কোন দিকে এখন দেখবার সময় কখন ? সব যে ছুটছে। আমি এই বয়সে তাদের সঙ্গে সমান পাল্লা দিয়ে কখনও যেতে পারি ? অথচ ধীরে ধীরে আমাকেও তো যেতে হবে ?

আপনারা হয়তো বলবেন, আহা, তোমার অত রাগ হচ্ছে কেন ? কিন্তু এই সব কাণ্ডের পরও অনুরাগটা থাকবে কি ক'রে বলুন তো ?

মশাই, এই বছর কয়েক আগে মাকড়ির চলন ছিল। তারপর ক্রমাগত দেখছি, ইকড়ি-মিকড়ি-চাম-চিকড়ি যে কত রকম-ফের হয়ে গেল, তা দেখে তো অবাক হয়ে যেতে হয়।

কি ব্যাপার ? না, প্যাটার্ন বদলাচ্ছে। বারকোসের মত কতক দিন কানচাপা মাকড়ি হ'ল। তারপরই দেখি ও মশাই, তিন মাস পরে দুই কানে দুই শিকে ঝুলছে, তার দু মাস কাটতে দেখি, ইয়া গোল্লা চাকা আর তাতে গোটাকতক ডম্বল লাগানো। শুনলুম, ফ্যাশান ! ভদ্রসমাজে নেমন্তন্ন-বাড়ি পাঁচজন মেয়ের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হবে তো ! অতএব নাও—স্যাকরার বানি দিয়ে মর ! রোজ তো আর তোমার সোনা কিনতে হচ্ছে না ?

না, কিনতে তো কিছুই হচ্ছে না, কারণ আমি যে সবার কেনা-গোলাম হয়ে আছি কিনা ? আমি হাড়ভাজা হয়ে পয়সার যোগাড় করি, আর তোমরা দিনরাত প্যাটার্ন বদলাও ! কিন্তু চাপে প'ড়ে আমার প্যাটার্নও যে বে-প্যাটার্ন হয়ে আসছে সে-দিকটা তো কেউ দেখছ না ?

পুরোনো কোন জিনিস কি ধীরে-সুস্থে এখন একটু থিতুতে পারবে ভাবছেন? অবিরত এত বদল দেখে আমি তো ক্রমশ শঙ্কিত হয়ে উঠছি মশাই, ঝঞ্ঝাটের গোড়াই তো সেইখানে।

এ কি রে বাবা ! আজকের জিনিস কালকেই ভাল লাগে না ? অর্ধেক জায়গায় তাই শুনি, খবরের কাগজপত্রেও প্রায় দেখি, অধিকাংশ স্ত্রীর তাই স্বামী সহ্য হচ্ছে না, স্বামীদেরও কাছে দু-চারদিন পরেই স্ত্রীরা হয়ে উঠছেন অসহ্য, ফলে ফারাক্ আইন পাস করাবার জন্যে সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছেন—হয়ত তা হয়েও যাবে।

কিন্তু তাও দেখুন বরাত এমন যে, সেটা পাস হ'লেও আমার

গিন্নীর তাতে কোন কাজ হবে না। সেখানেও তো আমার দেরী হয়ে গেল।

গোপ্‌লা ম্যালেরিয়ায় পঞ্চত্ব পাবার পর কুইনিন আবিষ্কৃত হ'লে গোপ্‌লার মা যেমন স-খেদে বলেছিল, সেই কুইনিন বেরুল, তবু সেটা গোপ্‌লা বেঁচে থাকতে বেরুলি নি বাবা! আমার দশাও হ'ল তাই, বুঝছেন না!

সংসারে এসে তাড়া খেলুম, ঝঞ্ঝাট পোয়ালুম, কিন্তু তার সুফলটা আর ভোগ করতে পারলুম না, এই আর কি।

এইটেকেই তো শাস্ত্রে বলেছে কর্মফল, আর আমরা বলছি ঝঞ্ঝাট!



কলকাতায় কদিন

কেমন কাটছে, জিজ্ঞেস করছেন তো? কেন আর ওসব ব'লে লজ্জা দিচ্ছেন দাদা? বরং জিজ্ঞেস করুন, তোমার খাটিয়া আসতে আর কত দেরী?

মশাই, মারপিট গুলিগালাজ খবরের কাগজে দু-একটা না থাকলে আমার আগে মনে হ'ত, দূর, আজকাল কাগজের লোকেরা কেবল ফাঁকি দিয়ে কাজ সারছে; কিন্তু কদিন কলকাতায় যে কাণ্ড গেল তা কি বলুন তো? কাগজ নির্ঝঞ্ঝাটে পড়তাম, সে বেশ ছিল; কিন্তু এ কিরে বাবা, এ যে ঘাড়ের ওপর তুমুল কাণ্ড! কখন কে যে কোথা থেকে কি করবে, তা আগে থেকে বোঝে কার বাবার সাধ্যি? বাপ রে বাপ, কি ঝঞ্ঝাট!

মশাই, হাঙ্গামার প্রথমদিন ভাবলাম, ট্রামে বাসে উঠে যেন তেন প্রকারেণ আপিসটা সারতে হবে তো? প্রাণ যাক, কিন্তু ওটা গেলে খাব কি? কিন্তু ও হরি! একটি গাড়ির টিকি দেখা গেল না মশাই! একখানা রিক্‌শা পর্যন্ত নেই!

সাত মাইল হাঁটা আবার সাত মাইল চতুর্দিকের হাঙ্গামা এড়িয়ে বাড়ির ছেলে বাড়িতে পরিবারের কাছে সন্ধ্যাবেলা হাজ্‌রে দেওয়ার মানে বোঝেন? বাপ রে বাপ! তার ওপর রাস্তায় কেবলই মনে হবে, এই বুঝি, কানটা ফুটো হয়ে গেল, এই বুঝি গলির মোড়ে ফস্‌ ক'রে কে একটা সাড়ে ছ ইঞ্চি ঝাড়লে! যা হোক, যেতে তো

হবেই। দুর্গা ব'লে বেরুলাম, কিন্তু ওইখানেই হ'ল প্রথম ভুল। ও নামের বদলে হরিনাম নিলেই ভাল করতাম। পাঁজির কথাটা গিয়েছিলাম ভুলে, কারণ এবার যে দেবীর ঘোটকে আগমন আর ঘোটকে গমন, ফলং ছত্রভঙ্গং, হ'লও তাই।

মশাই, বড় রাস্তা বাঁচিয়ে গলি দিয়ে যাচ্ছি, কোত্থেকে দুটো ছ-সাত বছরের ফচ্‌কে ছোঁড়া বেরিয়ে এসে মুরুব্বির মত বলে, কোথায় যাচ্ছেন?

পিত্তি জ্ব'লে গেল। গ্রহের ফের, তাই মুখ ভেঙিয়ে ব'লে উঠলাম, কেন? আপিসে। তোমাদের সে খোঁজে দরকার কি? তার উত্তরে তারা বলে কি জানেন? আজ আর আপিস যায় না, বাড়ি যান।

শুনুন একবার কথা! এখনও আধো-আধো কথা কয়, ভাল ক'রে কথা ফোটে নি, সে আমাকে আফিস যেতে বারণ করছে!



মহা রাগ হ'ল, এরা বলে কি? তারপর ভাবলাম, দূর কাদের ওপর রাগ করছি, এইসব প্যাঁট্‌কা ছেলে, ওদের আবার কথা! হুঁঃ! এই ভেবেই এগুলাম দু-চার পা। ও মশাই, কি বলব, একটু যেতেই কখন ফুচ্‌ ক'রে পেছন দিক থেকে এসে আমার কাছাটা টেনে খুলে দিয়েই পিট্টান দিলে! সামনেই ছিল এক গোবরের গাদা, কাছা বাঁচাতে গিয়ে

পড়লাম তার ওপর আছাড় খেয়ে, শেষ পর্যন্ত সেই কাছাও বাঁচল না, উপরন্তু গোবরগাদায় প'ড়ে কুমড়ো-গড়ান গড়িয়ে হাত-পা ছ'ড়ে একাকার। আর রাস্তার লোকের সে কি হাসি, যাকে বলে, এক বিতিকিচ্ছিরি দৃশ্য! বুঝুন ঝঞ্ঝাট।

এই বেশে আপিসে যাব? তা হ'লে তো তখনই নোটিশ পড়ে যে, আমি কোথায় দাঙ্গাহাঙ্গামা ক'রে এলুম! অগত্যা বাড়ি ফিরতে হ'ল, কিন্তু ফিরেও সেই ঝঞ্ঝাট। আমাকে ওই অবস্থায় ঢুকতে দেখেই পান্তুটা তাড়াতাড়ি গিয়ে রান্নাঘরে গিন্নীকে সুর টেনে টেনে খবর দিলে, মা, বাবা মারা-মারি ক'রে বাড়ি ফিরে এল!



হন্তদন্ত হয়ে গিন্নী ছুটে এসে আমায় দেখেই চোখমুখ কপালে তুলে ব'লে উঠলেন, ও মা! এ কি কাণ্ড! কোথায় মারামারি ক'রে এলে? পঞ্চাশবার বললাম, ওগো, আজ হাঙ্গামা হচ্ছে, বেরিও না, তা কি আমার কথা কানে যায়? নিজের মতেই সব। আপিসে একদিন উনি না গেলে আপিস যেন উঠে যাবে! তা কেন? নিজের ষোল আনা শখ, একটা হুজুগ না হ'লে যে উনি থাকতে পারেন না।

এর উত্তরে কি বলব বলুন তো? যাকে নিয়ে ঘটনা, সে হাজির থাকা সত্ত্বেও, বিনা জিজ্ঞাসাবাদে একতরফা ডিক্রী হয়ে গেল। এর ওপর পান্তুটা ট্যারা চোখে হঠাৎ আমার কাছার দিকে চেয়ে নাক টিপে 'ইস' ব'লে ঘর থেকে ছুটে পালাল। গিন্নী সেই দিকে দেখে

যেন আঁত্‌কে উঠলেন, আমায় তৎক্ষণাৎ কাপড় ছাড়িয়ে ফের নাইয়ে নিজে নেয়ে শুদ্ধ হলেন। কিছুতেই বোঝাতে পারলুম না, ওটার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই, ওটা পবিত্র জিনিস, বিশুদ্ধ গরুর। তিনি বললেন, ও একই কথা। মোদ্দা বোঝা গেল যে, গরু ও আমি অভিন্ন।

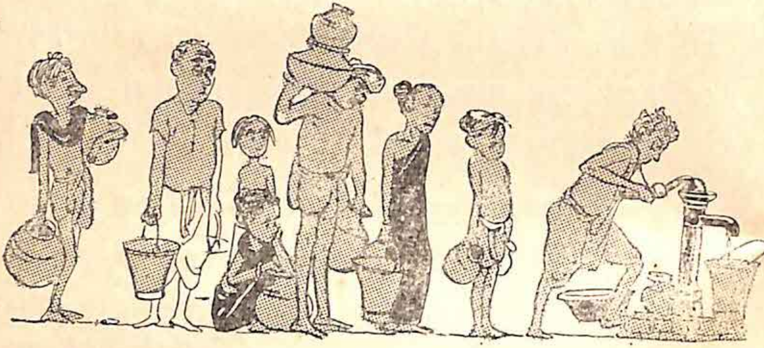
এর ওপর যা বললেন, তা আর আপনাদের শুনিয়ে গৃহের শান্তি ভঙ্গ ও নিজের প্রেস্টিজ না খোয়ানোই ভাল। কেবল বলেন, বুড়ো মদ্দ, ছোট ছেলেদের সঙ্গে লাগতে গিয়েছিলে, লজ্জা করে না? বুঝুন, আমি লাগতে গেলুম!

কর্মের ভোগ, কি করব বলুন? একটা পোস্টকার্ডও পাই না, অবশেষে কোনমতে তাই একটা জোগাড় ক'রে জ্বর হয়েছে ব'লে আপিসে ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে দিলাম; প'ড়ে গিয়ে শরীরটাও কাহিল হয়ে গিয়েছিল খুব। ভাবলাম, যাক, দুদিন কম্‌প্লিট রেস্ট নিলেই শরীর চাঙ্গা হয়ে উঠবে, তদ্দিনে গোলমালও মিটে যাবে, বাস্তবিক মিটলও। কিন্তু আমার ঝঞ্ঝাট কি এত সহজে মিটবে ভাবেন?

মশাই, প্রাতঃকালে উঠেই শুনি, কল একেবারে খল্‌খল্ ক'রে হাসছে, একবিন্দু জল নেই। বুঝুন, কি ব্যাপার! একান্নবর্তী পরিবারে বাস করি সত্যি কথা, কিন্তু কর্মক্ষম লোকের চেয়ে অকর্মা অবলার সংখ্যা সেখানে বেশি, তা ছাড়া সবারই আপিস।

জলের কল ধর্মঘট করেছে, অতএব তুমি ঘটি বাটি ঘড়া নিয়ে রাস্তার টিউবওয়েলে ছোট আর সেখানে লাইন দাও। ঝি-চাকর কই?

জল আনতে হবে একপোয়া পথ হেঁটে, তাও কি এক বালতি দু বালতি? উঃ, বাপরে বাপ! সে আনছিই! আর তেমনই খাসা টিউবওয়েলটি, তিনবার হেঁচ্‌কি দিলে তবে তার মুখ থেকে কিছু বেরোয়, রীতিমত কুস্তি করতে হয় তার সঙ্গে। তাও বিকেলে গিয়ে দেখি, তার ডাঁটি নেই, সবাই তার মাথায় চাঁটি মেরে মেরে দফা শেষ ক'রে দিয়ে গেছে! একে ধরুন বেচারীর অনভ্যেস, তার



ওপর হঠাৎ তার ডাঁটি ধ'রে সবার এত টানাটানি, যন্ত্র হ'লেও সইতে পারবে কেন?

একটা ভারীকে ধরলুম, বললুম, বাবা, এক কলসী জল দিবি? সে বললে, হাঁ দিব, চার আনা। তার মানে শুধু মুখ-ধোবার জন্যে সকালে এক টাকা জল লাগবে বাড়িতে। এর ওপর প্রাতঃকালের অন্যান্য কার্যাদি বাবদ জলের খরচটা হিসেব ক'রে নিন। আমি ছা-পোষা গেরস্থ মানুষ, আমার কাছে জলেরও এই দাম হ'লে বাঁচি কি ক'রে? এ রকম আদাজল খেয়ে আপনারা সবাই মিলে আমার পেছনে লাগলে আমার কি করা কর্তব্য, তাই বাতলে দিন প্রভু!

পূজোর ঝঞ্ঝাট

কি রকম পুজো কাটল আপনাদের ?

আমি তো প্রায় শেষ হয়ে এলুম, মশাই। পৃথিবীতে বর্তমানে বাস করা যে কি ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার, তা তো হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন ? এবার আবার পূজোর কদিন বুঝলেন তো বিধাতা কি রকম পেছনে লাগতে পারেন ?

উঃ, কী বৃষ্টি, বাপরে বাপ ! তাও কি হোমিওপ্যাথী ডোজে, একেবারে ফুল হাইড্রোপ্যাথী চলল কদিন ধ'রে। যা সঙ্কল্প করেছিলুম, তা তো হয়ে গেল পূজোর মধ্যে। ভেবেছিলুম, যাক, পূজোটা কাটবে নির্ঝঞ্ঝাটে, তার তো হিসেব গেল ঘুলিয়ে !

মশাই, পটকার জন্যে ঠায় রোদ্দুরে তিন ঘণ্টা লাইন ধ'রে দাঁড়িয়ে পাঁচ গজ ছিট, ঘেঁচির জন্যে ফ্রকের বাহারি কাপড়, গিন্নীর জন্যে তিন টাকা দশ আনা দিয়ে সস্থ কোরা কাপড়, পান্তর জন্যে একটা এগারো সিকি দিয়ে প্যান্টুলুন কিনে নিয়ে এলুম। পাড়ার তিনটি বাঁকে যে যা চাইলে, সর্বজনীন পূজোর চাঁদা দিলুম, ভেবেছিলুম তিন জায়গা থেকে মায়ের ভোগ চেয়ে এনে অন্তত নিজের ত্রিসন্ধ্যের রেশনটা বাঁচিয়ে ফেলব, তা হয়ে গেল ! কোথায় ঠাকুর আর কোথায় ভোগ ? কি আর করি ?

রাত্তিরে সবার খাওয়া-দাওয়া চুকলে কাঁচকলা সেদ্ধ ক'রে তিন দিন তাই গলাধঃকরণ করলুম, আর দেখলুম গিন্নী নতুন কাপড়খানা প'রে তিনবার চোখের সামনে বাহার দিয়ে বেড়ালেন আর ভবিষ্যৎ বংশধর আর রূপসীর দল ভাল ভাল জামা-কাপড় প'রে জানলার সিকের বাইরে ঠ্যাং বার ক'রে বৃষ্টির জল কতখানি কমছে বাড়ছে তাই সন্ধ্যে থেকে রাত্তির নটা পর্যন্ত পরখ করতে লাগল। এখন জ্বরে ভুগছে!

দেখুন দেখি, খামকা এই বাজারে কতকগুলো পয়সা নষ্ট হ'ল, কে কার জামা-কাপড় দেখলে তার ঠিক নেই, ঠাকুর এলেন কখন আর গেলেন কখন তা তো জানা গেল শুধু পাঁজি প'ড়ে। অথচ দেখুন, এর জন্যে দেড় মাস আগে থেকে বায়নাক্কা কত! কি—না, মা আসছেন! মা'র ব'য়ে যাচ্ছে।

ক্রমাগত তো দেখছি, মায়ের বদলে মারের পর মার আসছে, মা কই? এখনও যে এত ঝঞ্ঝাট নিয়ে টিঁকে আছি কি ক'রে, সেইটেই মাথায় ঢোকে না।

আমার তো মনে হয়, দেবতারা পালিয়েছেন। মায়ের দু এক জায়গায় মূর্তি দেখলুম কিনা ষষ্ঠীর দিন আর অষ্টমীতে, দয়া ক'রে সেদিন আর বৃষ্টিটা পড়েন নি ব'লে, কিন্তু যাই বলুন, মা দু-এক জায়গায় ছাড়া আর কোথাও আসেন নি, অধিকাংশ বারোয়ারিতে তো নয়ই।

এতদিন মা ছিলেন ছেলেপুলেদের নিয়ে একটি চালায়, এখন সব জায়গায় গিয়ে দেখি প্রত্যেক সন্তানটি তাঁর ভিন্ন গোত্তর, পাহাড়ের এক-একটি চূড়ো দখল ক'রে ব'সে আছেন। মা এতদিন

রুদ্রমূর্তিতে মানুষের থেকে অন্তত তফাৎ হয়ে দেখা দিতেন, সেই সমুন্নত নাসা, দীর্ঘ টানা চোখ, সেই ভ্রূর বিলম্বিত রেখা, সে সব কোথায়? মা আমার সিনেমার হিরোয়িনের মেক-আপ নিয়ে দাঁড়িয়ে। আর অসুরের পোজ কি? ওখানে উঠেও ছোকরা বায়স্কোপের প্যাঁচ দেখাচ্ছে, যেন তা না হ'লে কো-অ্যাক্টিং জমবে না! কি বিপদ বুঝুন!

আমার তো মনে হয় আসছে বার থেকে অসুরটাকেও ফারাক ক'রে দিলে প্রোডাক্‌শানটা জমবে ভাল। সিঙ্গির লেজের কাছে মনে করুন অসুর ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে পড়েছে আর মা-দুর্গা তার বুকে চেপে ওরিয়েণ্ট্যাল ডান্সের কসরৎ দেখাচ্ছেন, এই রকম গোছের আর কি!

কারণ, দেখছি কিনা শক্তিকে ক্রমশ আমরা ভাগ ক'রে চলেছি, বিকৃত করতে শুরু করেছি। মানে বাঙালীর যা হয়ে থাকে, এক পাড়ায় সাতখানা ঠাকুর, তাই, না পাওয়া যায় পুরুত, না মেলে ঢাকী; কারণ—রেশারিশি! এ-দলের জোর ও-দলকে দেখানো চাই আর এই অমুককে চাঁদা দিলেন আমাদেরও দিতে হবে, কিন্তু আমরা আর দিই কত? জীবনের চতুর্দিকে এই রকম চাঁদা ক'রে যদি চাঁটি খেতে হয়, তা হ'লে বাঁচি কি ক'রে? উৎসবের নামে যদি ক্রমশ এত ঝঞ্ঝাট বাড়তে থাকে, তা হ'লে ওসব বন্ধ ক'রে দেওয়াই ভাল!

মশাই, এই কথাটা একজন ভদ্রলোককে বলেছিলুম ব'লে তো তিনি আমায় যাচ্ছে-তাই ক'রে গালমন্দ দিলেন, বললেন, জানেন, এই উৎসব ক'রে আমরা কত কাঙালীকে খাওয়াই?

আমি বললুম, কাঙালী খায়ানো ভাল কথা, কিন্তু মধ্যবিত্ত বাঙালী আমরা আমাদের যে একবেলা ভাল ক'রে খাওয়া জুটছে না, মশাই। ওদের আর একদিন খাইয়ে হবে কি ? পেটের অসুখ বাড়াবেন বই তো নয়! তার চেয়ে জাতটাকে আরও সতেজ ক'রে তোলার চেষ্টা করুন না চাঁদা তুলে, যাতে দেশে কাঙালী কেউ না থাকে।

ব'লে এক ঝঞ্ঝাট! তাঁর সঙ্গে আরও পাঁচজন এলেন ছুটে, এখানে সত্যি কথা বললেই তো লোকের ব্লাড-প্রেসার বেড়ে ওঠে, তাই দল ভারি দেখে আমায় স'রে পড়তে হ'ল।

যাক, পূজোর পর্ব তো এক রকম ক'রে কাটল! এর পর নমস্কার আর আলিঙ্গনের ঠেলা, আজও সামলাচ্ছি। চার দিন জলের জন্য বেরুতে পারা যায় নি, ভেবেছিলুম, ও ঝঞ্ঝাট বোধ হয় জলের ওপর দিয়েই কাটিয়ে দেওয়া যাবে; কিন্তু বরাত খারাপ, এখনও চোখের জলে নাকের জলে হাবুডুবু খাচ্ছি।

সংসারে গুরুজনরা যদি একত্তরে থাকেন তো একসঙ্গে বিজয়া সারা যায়, কিন্তু কেউ থাকেন টালায়, কেউ টালিগঞ্জে, কেউ রামরাজাতলায়, যাই কি ক'রে বলুন তো ? ট্রাম, বাস, কাদা, বৃষ্টি, আপিস, রেশন, তেল, আলু সব সামলে আবার বিজয়া সারি কি ক'রে ?

এই দেখুন না, তিন দিন আপিসে লেট হয়েছে, ওপরওয়ালাদের মূর্তি হয়েছে ঠিক অ্যালুমিনিয়মের হাতাবাটি তুবড়ে গেলে যে রকম হয় ঠিক সেই গোছের, অথচ লেটের কারণ জানেন ?—ওই বিজয়ার কোলাকুলি!

মশাই, ট্রাম এসে গেছে, ঝুলতে ঝুলতে উঠেছি, পাশ থেকে টেনে ধরলেন খপ্ ক'রে এক পরিচিত ভদ্রলোক! আহা, মুখে কি হাসি! এক জোড়া দাঁতের পাটি বার ক'রে ব'লে উঠলেন, আসুন, আপনার সঙ্গে তো এখনও সারা হয় নি!

তার মানে, পনেরো মিনিটের জন্যে তিনি আমার দফা সারলেন। তার আগে তো আর গাড়ি পাবার জো নেই? বুঝুন, ঝঞ্ঝাট! একে তো রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে প্রত্যহ হাজার লোকের সঙ্গে বিজয়ার আলিঙ্গন সারতে হয়, তার ওপর এ এক ঝঞ্ঝাট!

তারপর ভাবুন আবহাওয়া, কি অবিশ্রান্ত বৃষ্টিই না হ'ল কদিন! ছাতা কোথায়? গুটি পাঁচেক আর-বছরে ঠেস দিয়ে কোথায় রেখে এসেছি, তা মনে নেই, নিশ্চয় সে জায়গাগুলোতে নেই। কিনতে গেলুম, খুব সস্তার যেটা, তার দাম এগারো টাকা চার আনা, এর ওপর আছে সেল ট্যাক্স, পুরো বারো টা কা ই ধরুন। বললুম, মশাই, গোটা পাঁচ-ছ টাকায় একটু সুবিধে গোছের ক'রে দিন দেখি একটা।



দোকানী বোধ হয় বাবুর দর-দেওয়া দেখেই বাবুরও দাম বুঝে ফেললে।

সে নিতান্ত অভব্যের মতই যে-ছাতাটা দেখছিলুম, সেটা ফস্ ক'রে হাত থেকে টেনে আবার ছাতার খাপে রেখে দিলে। কি বিপদ বুঝুন! আবার সঙ্গে সঙ্গে টিপ্পনী, পাঁচ-ছ টাকায় আর ছাতা পাওয়া যায় না, তার হাতা পাওয়া যেতে পারে।

রাগ হ'ল মনে মনে। আমিও একটু রাগতস্বরে ব'লে উঠলুম, মশাই, এর বাঁটটা তো বাঁশের!

সে আরও স্বর চড়িয়ে ব'লে উঠল, ইদানীং বাঁশের দর জানেন?

দেখলাম যে বাঁশ নিয়ে আর তর্ক ক'রে লাভ নেই, কারণ খেয়াল ছিল না।

অতএব ভিজতে ভিজতেই বেরিয়ে পড়লুম বিজয়া সারতে। রাস্তায় থই থই করছে জল। বর্ষণের তো কথাই নেই।

জুতোটি হাতে নিয়ে সর্বাঙ্গ জবজবে হয়ে যে-বাড়িতে গেলুম, শুনলুম, তাঁরা আবার অপর জায়গায় কোলাকুলি সারতে বেরিয়ে গেছেন। ফিরে এলুম। এখনও নাক দিয়ে সর্দি ঝরছে, ব্রায়োনিয়া-৩০ খেয়েও সামলাতে পারছি না। বুঝুন, ঝঞ্ঝাট কি রকম ভাবে আসে!

এততেও আপনারা বলবেন, ভগবান পরম দয়ালু! তা আর নয়?

তাঁর দয়াতেই তো আজকাল প্রাতঃকালে উঠেই প্রত্যহ আধ সের ক'রে আলু আনবার জন্যে লাইনে গিয়ে দাঁড়াতে হচ্ছে!

ভদ্রতার ঝঞ্ঝাট

সংসারে আপনি প্রতিজ্ঞা করুন যে কারুর কোন হাঙ্গামাতে থাকব না—গোলমালে যাব না—নির্বিরোধী হয়ে থাকব, দেখবেন—তা কিছুতেই পারবেন না; মানে আপনাকে তা পারতে দেবে না। লোকের স্বভাব হচ্ছে অকারণে বিরক্ত করা। লোককে সেটা যদি বুঝিয়ে দেন যে আপনি বিরক্ত হচ্ছেন, হাবে ভাবে আবার তা বোঝালে হবে না—ব'লে বোঝাতে হবে, তবেই আপনি হবেন অতি বদ্‌লোক, আর যদি ভদ্রতার খাতিরে কিছু না বলেন, তা হ'লে সারা জন্ম আমার মত মুখ বুজে প'ড়ে মার খান—আর ঝঞ্ঝাট পোয়াতে থাকুন!

আমার হয়েছে মশাই, বিপদ! যত নির্বিরোধী হয়ে একপাশে প'ড়ে থাকতে চাই তত বিরোধ বাড়ে। মানে, দেখলাম সমস্ত সংসার আমাকে নির্ঝঞ্ঝাটে থাকতে দেবে না ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছে। একটা দিনের শুধু ব্যাপার শুনুন!

সকালবেলা উঠে, গেরস্থ-লোক একটু বাড়ির কাজ-কর্ম সারতে হয়—খুব ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় এলেন একজন পরিচিত বন্ধু আড্ডা দিতে। তিনি বেশ ভাল রকম জানেন আমার অবস্থা, একটু পরে আফিস যাব, বাজার করতে হবে, কন্‌ট্রোল থেকে চালডাল আনব। ঠিক সেই সময় তিনি এলেন আপ্যায়িত করতে।

বসলেন তো ওঠেন না, কারণ তাঁর তাড়া নেই—এদিকে দেখছেন আমি উস্‌খুস্‌ ক'চ্ছি, কিন্তু ভদ্রতায় বাধছে বলতে যে, আপনি উঠুন : তাঁর ব'য়ে যাচ্ছে। আমি উস্‌খুস্‌ কচ্ছি, এতটুকুতেই অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ছি, হুঁ হুঁ ক'রে কথার জবাব দিচ্ছি, তবু নির্বিকার। শেষকালে বাধ্য হয়ে উঠে পড়লুম এবং চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে দেঁতো হাসি হেসে ব'লে ফেললুম, "আচ্ছা, আজ তা হ'লে উঠি, আবার অফিস যেতে হবে।"



'ও, তাড়া আছে বুঝি ?' এতক্ষণে তিনি হৃদয়ঙ্গম করলেন যে, আমার তাড়া আছে, তাও পূর্ণভাবে নয়, আংশিক। কারণ, দণ্ডায়মান হয়ে তাঁর আবার কথা চলল, হ্যাঁ, তা হ'লে আর আপনাকে ধ'রে রাখব না, একটা কথা—সেই ঘনশ্যামের ছেলেটা আজকাল কি কচ্ছে, অনেকদিন দেখা-সাক্ষাৎ হয় নি। সুরেনের মামীর শুনলুম খুব অসুখ, সেদিন দেখলুম ট্রামে চলেছে, চেহারাটাও খারাপ হয়ে গেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি তখন পায়ে পায়ে এগিয়ে বাড়ির ভেতর থেকে কয়েকটার জবাব ছাড়লুম এবং শেষকালে আর উত্তর দিলুম না। শূন্য দরজার দিকে চেয়ে তিনি এতক্ষণে 'আচ্ছা চলি, আর একদিন আসা যাবে' ব'লে এগুলেন। বুঝুন আক্কেল ! বলুন এর প্রতিকার কি ?

এদিকে তো ৮৷৷টা বেজে গেল, কখন রেশন আনব আর

বাজার করব? অতএব দ্রুত স্নান এবং তার চেয়ে দ্রুত হণ্টনে ট্রাম-ডিপোয় গমন। ইচ্ছে একটু ব'সে যাওয়া, তা সেখানে পৌঁছে দেখলুম সে ইচ্ছাটা অফিসের টাইম্ কাবার হ'য়ে গেলে হয়ত পূরণ হ'তে পারে। সমস্ত ভর্তি।

মাত্র সামনের সিটে একজন হোমরা-চোমরা ভদ্রলোক ব'সে আছেন। তাঁর পাশেই খালি দেখে বসলুম। কিন্তু পরে বুঝলুম কাজটা ভাল করি নি! কোম্পানী ছুটি লোকের বসবার জন্যেই মাপ ক'রে সিট তৈরী করেছিলেন কিন্তু আমার পূর্ববর্তী আরোহী মহাশয়ের তা ইচ্ছে নয় ব'লে তিনি আগের দখ্‌লিকার হিসেবে কেৎরে ব'সে আছেন।

সোজা হ'য়ে বসলে পার্শ্ববর্তী লোকটির যে একটু স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধে হ'তে পারে এইখানেই তাঁর আপত্তি।

কোনক্রমে বসলুম। ভেবেছিলুম একজন পাশে এসে বসলে হয়তো ভদ্রলোক করুণা ক'রে একটু সোজা হবেন কিন্তু তাঁর ব'য়ে গেছে, অসাড়! শরীরের অর্ধভাগ শূন্যে রইল, বাকীটুকু ১ ইঞ্চি পরিমাণ জায়গায় ঠেকানো। একবার একটু ভদ্রতার ইঙ্গিত জানাবার জন্য ঈষৎ একটু ঠেলা দিলুম, তিনি মিক্‌শ্চারের শিশি নাড়ার মত নিজের দেহটাকে সেই স্থানেই একটু নেড়ে নিলেন, যেন জানালেন "এই তো তোমার কথা রেখেছি বাপু, আর জ্বালিও



না।" যে ভাবে তিনি বসেছিলেন তা দেখলে মনে হয় যেন ভদ্রলোক তাঁর পিতৃদত্ত জমিদারিতে তাকিয়া হেলান দিয়ে একটু পরেই আলবোলা টানবেন বোধ হয়।

হঠাৎ উঠেই বা দাঁড়াই কি ক'রে? বলিই বা কি? একটা হাস্যোদ্দীপক অবস্থার মধ্যে নিজেকে নিপতিত করার প্রবৃত্তি আমার হ'ল না। ভদ্রতার খাতিরে কিছু বলতে না পেরে সমানে জিম্‌নাস্টিকের কসরৎ করতে করতে একটা উরুর ওপর ভর দিয়ে ডিপো থেকে পাঁচ মাইল মনে করুন আপিসে এলুম। কি ঝঞ্ঝাট বলুন তো?

একটি ফাউণ্টেন পেন আছে। পাঁচবার সারিয়ে হয়তো লিখছি, ঠিক সেই সময়ে প্রত্যেকের কলমটি দরকার এবং কলমটি অপরের ব'লে সেটিকে চাপ দিয়ে লেখা চাই তাদের—দুদিন পরে চাপের চোটে সব গেল ঢলঢলে হ'য়ে। বাঙালীর মুঠোর মধ্যে কিছু থাকবার জো আছে?—অত চাপ সইবে কেন? আর সব সময় লোককে কি বলা যায় যে, 'মশায়, একটু আলতো চাপ দিন!' কি ঝঞ্ঝাট বলুন তো! যদি না দিই, লোকে বলবেন, "একবার দিলে কি ক্ষয়ে যাবে? কিন্তু ওদিকে আমি যে দিতে দিতে ক্ষয়ে গেলুম, সেটা বুঝছেন কি?

সিগারেট আজকাল গুরুজনের সামনে খাওয়া ভাল, কারণ তাঁরা চাইবেন না, কিন্তু বন্ধুবান্ধবের সামনে প্যাকেট খোলার জো আছে? আড়ালে খুলে খান তখনি শুনবেন, 'দেখি একটা ভাই, কেউ আবার তাও বলেন না শুধু দুটো আঙুল বাড়িয়ে দেন অর্থাৎ তাতে সিগারেটটা পরিয়ে দাও, এইভাব—বুঝুন ব্যাপার!

মাইনের টাকা নিয়ে বাড়ি এসেছি—তিনজন মহাবিপদগ্রস্ত হ'য়ে উদ্ধারের জন্যে আমার কাছে ছুটে এলেন—কিছু ধার দাও ! দিন তিনেক পরেই ফিরিয়ে দিয়ে যাব—না যদি দিই ভদ্রতায় বাধে, আর যদি দিই বাড়িতে কুরুক্ষেত্র হয়। চুপি চুপি দিলুম এবং ব'লে দিলুম, "ভাই, সংসারের খরচ থেকে দিচ্ছি।" তাঁরা আমায় এমন আশ্বাস দিয়ে গেলেন যেন এই যাব আর চ'লে আসব এই রকম ভাব—আজও তাঁরা আসছেন—আমি ব'সে আছি, মাস সাতেক কেটে গেছে গিন্নীর সঙ্গে নানান্ তালগোল ক'রে আজও হিসেব মেলাতে পারছি না। বুঝুন ঝঞ্ঝাট !

সেদিন নতুন দুখানি রেকর্ড কিনে নিয়ে এলুম। পাশের বাড়ির চক্রবর্তী মশাই শুনলেন—অতএব তাঁর বাড়িতে একবার সেগুলি শোনানো চাই। মেশিন, রেকর্ড ম্য়ায় পিন সব চ'লে গেল ! মাস দুয়েক পরে অবশ্য ফিরেও এল একদম নতুনভাবে—সমস্ত মনে করুন প্লেন হয়ে গেছে ! তার জন্য চক্রবর্তী মশায়ের বিন্দুমাত্র লজ্জার কারণ নেই, বরং চক্রবর্তী মশাই বললেন "নিন মশাই, আপনার যন্তর ফিরিয়ে. ছেলেপুলেগুলো দিনরাত যখন তখন বাজিয়ে বাজিয়ে একেবারে কান ঝালাপালা ক'রে দিলে, তাই আমি আজ জোর ক'রেই টেনে নিয়ে এলুম !" অর্থাৎ এই বিরক্তিকর যন্ত্রটা আমিই যেন মাথার দিব্যি দিয়ে তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিলুম—তিনি আজ তা আমার হাতে সমর্পণ করছেন। কিন্তু যখন তা সমর্পণ করলেন তখন প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও তার আওয়াজ বার করা গেল না। যদি বলেন, "দাও কেন ?" খুব ভাল কথাই বললেন ! আমায় তো ভদ্রতা রেখে

সমাজের পাঁচজনের সঙ্গে বাস করতে হবে? থাকলে 'না' বলি কি ক'রে?

এই জন্যে তো মনে করুন সম্প্রতি বই কেনা ছেড়ে দিয়েছি। একশো একাশি জন বন্ধু বই কেনেন না, চেয়ে পড়েন। আমি আহাম্মক, আমি কিনি। তাঁরা পড়তে নিয়ে যান এবং তারপর বাড়িতে সাজিয়ে রেখে দেন। যাঁরা আবার এর মধ্যে সমজদার লোক তাঁরা আবার সেগুলি যে কত ভাল লেখা তা পড়াতে তাঁদের অন্যান্য বন্ধুদের কাছে চালান ক'রে দেন—আমি তার বছরখানেক পরে পুরানো বইয়ের দোকান থেকে আমারই নাম লেখা বই কিনে নিয়ে আসি। যদি না দিই তা হ'লে বন্ধুত্ব থাকে না!

মেয়ে গান শেখে, একটি হারমোনিয়ম কিনেছিলুম কিন্তু পাড়া-প্রতিবাসী, আত্মীয় স্বজনের সেটির সুর এত পছন্দ যে কেনা এস্তক তা আমার বাড়ি থাকে না —তাঁদের বাড়িতেই ঘোরে। একবারটি চাইলে তো 'না' বলা যায় না—দিতে হয়। ফলে সেটির বর্তমান অবস্থা হয়েছে শোচনীয়, এখন সেটি থেকে আর আওয়াজ বেরোয় না—দীর্ঘশ্বাস বেরোয়।

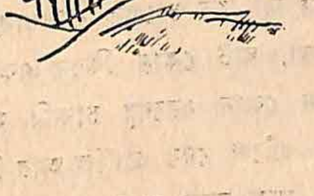


বলুন দেখি কি ঝঞ্ঝাট? আমি করি কি? সকাল বেলা কাগজ আসে, তা পাশের বাড়ির মিত্তির মশাই আমার বাড়ি এক কাপ চা খেয়ে নিয়ে যান। ট্রামে খবরের কাগজটা পড়ি তাও



নির্ঝঞ্ঝাটে পড়বার জো আছে ? ঠিক পাশের লোকটির সেটি দরকার ! "স্যার, কাইণ্ডলি দেবেন একখানা পাতা !" বুঝুন !

আমি জানি আপনারা বলবেন —কেন, ক্ষয়ে যাবে কি ? না, ক্ষয়ে যাচ্ছে না কারুরই কিছুই—কারণ এদিকে আমি যে শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র শর্মা হ'য়ে ব'সে আছি !



পূজোর পর

বুঝলেন মশাই—এবার সত্যি সত্যি কাহিল হয়ে পড়েছি। পূজোর মাস কাটলো না তো আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল! কিন্তু কাটবার আগে আমাকে একেবারে কুঁজো ক'রে দিয়ে গেল। এই বাজারে—যে কটি পয়সা রোজগার করি, তা তো হাতের তেলো থেকেই হাতে হাতে মিলিয়ে যায়; ওতে কোন উপকার তো হয়ই না শুধু ঝামেলা বাড়ে। তার ওপর যখন আবার কোন পাল পাব্বণ আসে তখন তো আর দেখতে হয় না—ঝঞ্ঝাট আর ঝঞ্ঝাট, বাপ্‌রে বাপ্‌! সর্ষে ফুল তো আজকাল চোখে পড়ে না—ও তো রেশন-আপিসে কণ্ট্রোল হ'য়ে গেছে—চতুর্দিকে চোখের সামনে শুধু ধুতরো ফুল দেখতে থাকি।

দুর্গাপূজো করি না—অবশ্য চাঁদা দিই। তারপর আসে লক্ষ্মীপূজো, সেটা বাধ্য হ'য়ে করতে হয়, মঙ্গল অমঙ্গল দেখতে হবে তো—যদিও জানি যে মায়েয় দয়া আমার ওপর কোনদিনই হবে না—তা যদি হ'ত তাহ'লে চালের কারবার, তেলের কারবার কাপড়, কাগজ, রাস্তা, ঘাট কোন কিছুর একটা না একটা মোটা কণ্ট্রাক্ট, নিদেন এমন কোন ধরণের চাকরি যাতে লোকে পান খেতেও কিছু হাতে গুঁজে দেয় তা কি আর তিনি পাইয়ে দিতেন না? তা নয়, সেই মাস আন আর মাসের প্রথমেই যথাসর্বস্ব লোককে দিয়ে হাত ধুয়ে ব'সে থাকো।

অথচ মনে করুন, মা ঠাকরুণের জন্যে বাজার থেকে দিব্যি পুরুষ্টু কাঁঠালী কলা, পাকা পেঁপে, আক, শশা এই সব তিন গুণ দাম দিয়ে কিনে আনি, কিন্তু এতেও তাঁর মনে ওঠে না। চুপড়ির মধ্যে তিনি আছেন কি গেছেন বোঝবার জো নেই।—একদিন গিন্নী বল্লেন, "নিশ্চয় আছেন! তিনি নাকি ভক্তিভরে প্রণাম করতে গিয়ে চুপড়ি নড়তে দেখেছেন, আমি তাই শুনে চুপড়িটির জন্যে একটি কাঠের সিংহাসন কিনে নিয়ে এলুম কিন্তু সেটিকে যথাস্থানে স্থাপন করতে গিয়ে দেখলুম, ঠাকরুণের বড়দার একটি ছোট্ট বাহন ফুড়ুং ক'রে সেখানে থেকে বেরিয়ে পালালো। ব্যাপারটা আর কাউকে ভাঙ্‌লুম না। কারণ, জানি কিনা, বলতে গেলেই আরও বিপদ হবে। তখনই ইঁদুর-কল একটা না হ'লে কেউ ভাঁড়ারের দিকে যাবেন না! মিথ্যে খরচ বাড়িয়ে লাভ কি?

যাক্, অভ্যেসের বশে যেমন দশটার সময় অফিসে যাই তেমনি অভ্যেসের বশে লক্ষ্মীপূজোও সারতে হয়, কিন্তু যখন দেশ জুড়ে উৎসবের ঘটা লাগে তখনই হয় যত ঝঞ্চাটের আমদানি!

মা দুর্গা তো এবার সকলকে চোখের জলে নাকের জলে ক'রে বাংলা দেশ থেকে চ'লে গেলেন, সম্ভবত আমাদের মত বেচারীদের একেবারে নাজেহাল অবস্থা দেখে তাঁরও চোখের জল বাধা মানে নি —কিন্তু তারই পরে এলেন আনন্দের ফুলঝুরি ফোটাতে মা কালী আর দেওয়ালী—অথচ একটু তিনি বুঝলেন না যে মায়ের সন্তানদের বাক্স একদম খালি—ভক্তির গুড়ে বালি—দেওয়ালীর বাতি জ্বালব কি ক'রে সেই ভাবনায় চোখে কালি আর মুখে কাওয়ালী ভেঁজে চলেছি। কি যে করি ভেবে পাই না!

ইতিমধ্যে বড় ছেলে পট্‌কা নাচ্‌তে নাচ্‌তে এসে হাজির, "বাবা বাজী কিনে দাও!"

আমি বললুম, 'বাবা, বাজার যা পড়েছে তাতে বাজী-ফাজির নাম ক'রো না—দেখছ এবার কার্তিক মাসে কেউ একটা আকাশ-পিদ্দিম জ্বালতে পারে নি, মিছিমিছি বাজী পুড়িয়ে কোন কাজই হবে না।

এই যেই বলা, আর যায় কোথা? সে বেটা তো মেঝের ওপর তিনটে ডিগবাজি খেয়ে একেবারে ফুল ফোর্সে ঠ্যাং ছুঁড়তে শুরু ক'রে দিলে—তিন বার চরকি বাজীর মত পাক মারলে—পাশেই তার মা ব'সে আলোচাল বেছে বেছে তার থেকে ইঁট পাটকেলগুলো



আলাদা আলাদা জায়গায় সরিয়ে রাখছিলেন, পড়ল সেইখানে তার এক লাথি—একটা ইঁট ছট্‌কে এসে লাগল আমার নাকে, আমি তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে উঠে সামলাতে যাব, পাশে ল্যাবেঞ্চুস খেতে খেতে কখন ঘেঁচিটা এসে দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে লাগালুম এক ধাক্কা—সে চিৎপাত হ'য়ে মাটিতে প'ড়ে পরিত্রাহি চেঁচাতে শুরু ক'রে দিলে এবং তার চেয়ে চড়া গলায় গিন্নী আমার ওপর এমন খিঁচিয়ে উঠলেন যে আমি তাঁর পূর্ণ বক্তব্য শোনবার আগেই পাড়ার মোড়ে ফুলঝুরি আর ধানি পট্‌কার দরদস্তুর শুরু ক'রে দিয়ছি। বুঝলুম তা না হ'লে ঝঞ্ঝাট কাটবে না আর পট্‌কা সারাদিন ধ'রে সবাইকে

ছুঁচোবাজী দেখাবে। দর করলুম ফুলঝুরি! দশ আনা বাক্স, চেঁচাড়ীর কাঠিতে বারুদ লাগানো। তাই লোকে খাব্‌লা খাব্‌লা ক'রে কিনে নিয়ে যাচ্ছে। দেখলুম যে বাড়ীতে যে-কটা ছেলেপুলে আছে তাদের হাতে যদি মাথাপিছু দুটি ক'রেও দিই তাতেই তিন টাকার ওপর ধাক্কা। "জয় মা কালী" বলে, তাই কিনে নিয়ে গেলুম পাঁচ বাক্স—তার মধ্যে আবার সব কটা পুড়লো না, শুধু গিন্নীর কাছে আমার নিজের মুখটা পুড়লো, তিনি বেশ মিষ্টি মিষ্টি ক'রে শোনালেন, উনি বাজী এনেছেন তো, তা হ'লেই হয়েছে! কোত্থেকে সস্তায় মস্তায় বাছপড়া জিনিস এনেছেন, ও কি আর এ বছরে জ্বলবে, তোরা আর বছরে জ্বালিস্।" বুঝুন ঝঞ্ঝাট! আমি ন্যায্য দাম দিয়ে বাজী আনলুম, সে বেটা জ্বললো না, মাঝখানে আমার পিত্তিটা জ্বালিয়ে দিয়ে গেল।

আবার এর পরেই পান্তুর ফরমাস। "আমাকে একটা চরকি কিনে দাও।" ভাবলুম পুত্রস্নেহের আতিশয্যে আবার এখুনি গিন্নীরও না সেই আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে, তাই তাড়াতাড়ি তার হাত থেকে একটা ফুলঝুরি নিয়ে 'এই দেখ্ চরকি বাজী!' ব'লে বুড়ো মদ্দ ছাতের ওপর বাঁই-বাঁই ক'রে ঘুরতে শুরু ক'রে দিলুম—ওরা পেলে মজা, বলে, 'আবার দেখাও?'



ব্যাস্! তিন কোয়ার্টারের জন্যে নিশ্চিন্দি! চরকি ঘুরছেই, শেষে মাথা ঘুরে মরি আর কি! বুঝুন সংসার কি রকম করছি!

যদি না করি তা হ'লে তো বনে গিয়ে বাস করতে হয়, ছেলে-পুলে স্ত্রীকে নিয়ে তো আর এখানে থাকা চলে না অথচ ঘর করতে হবে তো ?—তা না হ'লে তো আপনারাই আবার খবরের কাগজে গাল দিতে থাকবেন, 'বেটা কি পাষণ্ড দেখ, একটু ঝামেলা পোয়াতে হবে ব'লে নিরুদ্দিষ্ট হ'য়ে ব'সে আছে।' তাই আর করি কি ? বাড়িতেই আছি।

তারপর বাজী গেল, এল ভাই-ফোঁটা। গিন্নীর সাধ মেটাতে তো হবেই, তা না হ'লে সারা বছর কত খোঁটা খাব বলুন ? তিনি বাজার থেকে তিন টাকার রসমুণ্ডি সন্দেশ আনলেন—দেখা গেল সেগুলো একটা মাঝারি থালার ওপর প'ড়ে একবার এদিক আর একবার ওদিক কানাচের ঠুকনি খেতে খেতে হেসে গড়াগড়ি যাচ্ছে, তাদের হাসি থামাতে গেলে আরও টাকা ছয়েকের মাল না ছাড়লে চলবে না ; অতএব তৎক্ষণাৎ—'ওগো শুনছ, ৶০ আনা ক'রে সন্দেশের আজকাল কি ছিরি হয়েছে দেখ !'

এর মানে বুঝলেন তো ? একেবারে মহামারি ব্যাপার ! মানে আজকাল ছিরি ফোটাতে যাওয়ার অর্থ কি তা বুঝে দেখুন ! তার চেয়ে জাপানীদের হারাকিরি করা সহজ।

যদি বলেন, 'ঐ সাজিয়ে গুজিয়ে দিলেন না কেন ?' তার উত্তরে বলব, 'মশাই, আমি গরীব কেরানী, ওকে সাজানোর আধুনিক আর্ট আমি এখনও রপ্ত করতে পারি নি।'

বেরিয়ে পড়লুম, কিন্তু তাও কি নির্ঝঞ্ঝাটে ? গিন্নী আবার তিনখানি মাঝামাঝি দামের দিশী কাপড় ওরই সঙ্গে কিনে নিয়ে আসার তাগিদ দিলেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে আশ্বাস দিয়ে জানিয়েও

দিলেন যে আর দু'জনের জন্যে তিনি তাঁতিনীর কাছে থেকে আগেই কাপড় কিনে রেখেছেন, তাদের আর আনতে হবে না।

আমি একটু কিন্তু হ'য়ে ব'লে উঠলুম, 'দেখ, এ-বছর দিনকাল খারাপ, ওটা থাক্ না!'



গিন্নী ঝাঁঝিয়ে ব'লে উঠলেন, 'কী?—বচ্ছরকার দিনে ক'টা ভাইকে দেখব না?'

বুঝলুম তর্ক করা মানে আরও ঝঞ্ঝাট বাড়ানো। কারণ তিনি ভাইদের দিকটা দেখলেন কিন্তু আমার অবস্থাটা ভেবে দেখলেন না। কি করতে পারি বলুন?

এই নিয়ে একটা পারিবারিক শান্তিভঙ্গ তো করা যায় না? বুঝলুম, সংসার যখন ফেঁদেছি তখন পাঁচ শালার জন্যে এরকম আক্কেল-সেলামী তো দিতেই হবে।

হাঙ্গামার হাল

কেমন আছি জিজ্ঞেস ক'রে আর লজ্জা দিচ্ছেন কেন দাদা ? একেবারে নির্ঝঞ্ঝাটে কাটিয়ে দিচ্ছি ! বেশি কিছু নয়— দুটি পায়ে দুটি গোদ নিয়ে ব'সে আছি। ট্রামে বাসে তো আর ওঠবার জো নেই ! নিত্যি হাঙ্গামা লেগেই আছে !—এ কী ?

প্রত্যহ সাত মাইল হেঁটে আপিসে যাওয়া আবার সাত মাইল ব্যাক্ ক'রে নিজেকে নির্বিবাদে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসা— ইয়ার্কি ?

আবার আপিসে পৌছে পাঁচতলা সিঁড়ি ভেঙে ওঠা-নামা— ওঃ ! সে কী আনন্দ ! ওপরে উঠে এমনিতেই হারমোনিয়ামের ছ্যাঁদা বেলোর মত আধ ঘণ্টা ধ'রে ফুস্ ফুস্ ফোঁস্ ফাঁস্ করতে হয়, তা হ'লে বর্তমান পরিস্থিতিতে দেহ এই বয়েসে কেমন থাকে একবার অনুমান ক'রে নিন !

তার ওপর বছর দুয়েক ধ'রে আপনাদের কথায় কথায় হরতাল, ধর্মঘট, দাঙ্গা-হাঙ্গামা—এ তো লেগেই আছে। আপনারাও সোজা-পথে চলবেন না, আমাদেরও সোজা পথে হাঁটতে দেবেন না, এ তো প্রতিজ্ঞা ক'রে ব'সে আছেন। এ-রকম করলে বাঁচা যায় ? প্রত্যেক জানাশোনা গলির মোড়ে দেয়াল ঘেঁষে আধ ইঞ্চি পরিমাণ নাকটি একটু বাড়িয়ে চতুর্দিকের আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ ক'রে এগোনো আর গোলমাল বুঝলেই সড়াৎ ক'রে আবার নাকটি টেনে

নেওয়া এ কি কম কৌশলের কথা—তার ওপর হরিবাবুর সঙ্গে যাওয়া! ওঃ, সে এক দুর্ভোগ!

সারাক্ষণ তাঁর বাত্তেলা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হ'য়ে যাবে। 'মশাই, আশে পাশে চেয়ে চলুন, খুব সাবধান, দিনকাল বড় খারাপ, বাড়িতে ছেলেপুলেগুলোকে রাস্তায় বেরুতে বারণ ক'রে দিয়ে এসেছেন তো?—ওঃ, কাল যা পাড়ায় দেখেছি, পরশু যে ক'রে বাড়ি ফিরেছি' ইত্যাদি ইত্যাদি শুনে মুহুর্মুহু প্রাণ আঁৎকে ওঠে।

অথচ তাঁর পাড়ায় কিচ্ছু হয় নি। আমি খুব ভাল ক'রে জানি এবং তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন ব'লে যে-সব বর্ণনা করেন তার প্রত্যেকটি অবিশ্বাস্য। কিন্তু আশ্চর্য, লোকটি অনর্গল মিথ্যা কথা ব'লে যাবেন এবং রাস্তায় খাম্‌কা লোক জোগাড় ক'রে হাঙ্গামা বাধাবেন। মানে, কলকাতা থেকে নৈহাটি পর্যন্ত যা ঘটনা প্রত্যেক জায়গায় ঘটেছে, হরিবাবু যেন স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং তার লোম-হর্ষক বর্ণনা রাস্তায় চলেছেই।

১৪৪ ধারা জারী হ'তে আমি ওঁর সঙ্গে যাওয়াই ছেড়ে দিলুম। চক্কোর্তী মশাই পাশের অফিসে কাজ করেন, তিনি সঙ্গী হলেন। তাঁর সঙ্গেও দেখলুম নির্ঝঞ্ঝাটে পথ চলা অসম্ভব। গোড়ার দিন—বেশি হাঁটলে শরীর ভাল থাকে, আমরা না হেঁটে হেঁটে ডাইবিটিসে ভুগছি, আমাদের সহজে বাত ধরে—শুনতে শুনতে বেশ যাওয়া যাচ্ছিল। ও মশাই, তার একদিন পরেই দেখলুম তিনি বার করলেন এক ভাঙা ছাতা। আমি গলির মোড়ে আস্তে আস্তে নাকটি বাড়িয়ে দিই, সে এক রকম; তিনি দেখি, বড় রাস্তার পরিস্থিতি

বোঝবার জন্যে গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে ছাতার বাঁটটি উঁচু ক'রে আগে এগিয়ে দেন।

একদিন গেল সেটা দড়াম্ ক'রে উড়ে। ইঁটে গেল কি লাঠিতে গেল, কি গুলি খেয়ে গেল, কি হোঁচট্ খেয়েই গেল পরমেশ্বর জানেন —তা দেখবার জন্যে তিনিও রইলেন না, আমিও না। ছুট, ছুট, ছুট!

বেলা আড়াইটার সময় আরও আড়াই মাইল ঘুরে হাঙ্গামা বাঁচিয়ে আপিসে পৌঁছলুম। চক্কোত্তী মশায়ের আপিসে পরদিন খোঁজ করতে গিয়ে জানলুম, তিনি কলেরা হয়েছে ব'লে দরখাস্ত ক'রে ব'সে আছেন—অথচ আমি জানি তাঁর কিচ্ছু হয় নি। তবে এই ঘটনার পর যদি পেট নাবিয়ে থাকে বলতে পারি না।

এ তো গেল পথের হাঙ্গামা তার ওপর বাড়ির হাঙ্গামা শুনুন। এই গোলমালের মধ্যে আবার শেষ লগনসায় গেল মেজ বোনের মেয়ে ভুঁদিটার বিয়ে। ভগ্নীপতি, ভগ্নী এবং তাঁদের আত্মীয় স্বজন গুষ্ঠিবর্গ যে যেখানে আছেন 'জয়হিন্দ' করতে করতে আমার বাড়ীতে তো ঠেলে উঠলেন, দেখুন দেখি আক্কেল! এদের নিয়ে কি ঝঞ্চাট পোয়াতে হয়েছে তা আপনাদের কি বলব।

এই বাজারে কোথায় কি জিনিস-পত্তর যোগাড় হয় বলুন? বিয়ের ব্যাপার—উনকোটি, চৌষট্টি এমনি তো লেগেই থাকে, তার ওপর মনে করুন মেয়েদের আর ফর্দর কম্‌তি নেই।

এটা আনো, সেটা আনো, এই বরযাত্তির আসবে, এই কন্যে-যাত্তির আসবে, খাবে, তাদের খ্যাটের বন্দোবস্ত কর, আইনের ফাঁকির বন্দোবস্ত কর, তার পর আরও পাঁচটা করণীয় কর্তব্য

আছে সে গুলোও কর···উঃ, বাপ্ রে বাপ্, এই বাজারে নমস্কারী কাপড় থেকে মতিহারী পান্তুয়া পর্যন্ত যোগাড় করা সোজা কথা? কিন্তু অবুঝ যারা, তাদের সব কথা বোঝাই কি ক'রে?

তবু আমি পাঁচশো বার বললুম 'ওরে, তোরা সব বাদ দে, এই ঝঞ্ঝাটের সময় লোক-লৌকিকতা করার কোন দরকার নেই।' তা কে শুনছে আমার কথা?

তা ব'লে চারটে মাসীকে বলা হবে না? মেজ-পিসিমার ননদরা সব কাজে আমাদের বলে, তাদের না বললে ভাল দেখায়? বড়দির, ছোট-জা ভুঁদির তিন তিনটে সায়া সেলাই ক'রে দিয়েছে তাকে বলব না? ছোট্ট-ঠাকুমার ভাসুর-ঝিকে না বললে বরণডালা তৈরী করবে কে? ন-মাসীর দেওর-ঝিদের না বললে চলে? বড় মামার দুই শালীকে বাদ দিলে আর কি এমন খরচটা কমবে?—তা ছাড়া কুটনোর এই গাদা কুটবে কে? এত পান সাজবার লোক কোথা? আর সত্যি কথা, ভুঁদির তো আর পাঁচবার বিয়ে হচ্ছে না? জন্মের মধ্যে কম্ম এই তো একবার বিয়ে—নিন, প্রতিবাদ করুন।

যদি বলি, ওরে বাবা খবরের কাগজটা প'ড়ে দেখেছিস্, কি হাঙ্গামা আর কি দুর্ভিক্ষ ঘনিয়ে আসছে জানিস্? এ সময় এসব ক'রে খাবার নষ্ট করা উচিৎ নয়।

তার উত্তরে ঝট্ ক'রে ব'লে দিলে, যখন সবাই না-খেতে-পেয়ে মরবে, আমরাও মরব। ভুঁদির বিয়েতে তো এখন আমরা খেয়ে নিই।

ইচ্ছে হয় এক এক সময় চীৎকার ক'রে বলি, ওরে আমার

মাথা-খা, আমি আর পারি না! কিন্তু তাতেই বা ফল কি? এ-যুগে মাথা ঠাণ্ডা ক'রে কে কার কথা শুনছে? সব যে মেজাজ তিরিক্ষি!

যাক্ মশাই, ম'রে বেঁচে তো বিয়ের আয়োজন করা গেল—সে কি সহজ ঝঞ্ঝাট?

বর জমিদারের ছেলে অর্থাৎ এক অজ পাড়াগাঁয়ে দশ বারো কাঠা জমিদারী আছে, বাকি প্রজাবিলি। বছরে বারো-আনা ক'রে বোধ হয় খাজনা পান, কিন্তু বনেদী ঘর যে সেটা নজর দেখে বোঝা যায়। অর্থাৎ বেয়াইয়ের যা আছে তার প্রত্যেকটিতেই তিনি হ্যাংলা ছেলের মত আগে থেকে নজর দিয়ে ব'সে আছেন এবং আমার বুদ্ধিমান ভগ্নীপতি যথাসর্বস্ব বন্ধক-বিক্রী ক'রেও থৈ পাচ্ছেন না। এর ওপর পাত্র রোজগেরে, সব-রেজেস্ট্রি আপিসে মাসিক পঁচিশ টাকা বেতন পান—সরকারের চাকরি বড় যে-সে ব্যাপার নয়; পঞ্চান্ন বছর পরে ভিমরথি ধরলেও বিছানায় শুয়ে শুয়ে সাড়ে বারো টাকা পেনশেন পাবে।

এ হেন পাত্র মনে করুন—'আকাশে চাঁদ ছিল যে' গোছের ব্যাপার, তার দান-সামগ্রী যোগাড় করতে পাঁচবার গঙ্গাস্নান করতে হ'ল—না হ'লে মাথা গরম হ'য়ে কেলেঙ্কারী কাণ্ড হবার উপক্রম! বরপক্ষ যে কি না চান তা বুঝতে পারলুম না। এ সবের মূল তো আপনারাই—ভগবান ঢেলে দিয়েছেন, আর আপনারা কুটুমের কাছে চাল দেখবার জন্যে ঠেলে খরচা করছেন, আর আশপাশের গেরস্থর মেয়েছেলেরা তাঁদের ছেলের বিয়ের

সময় বেয়াইকে তেলের ঘানিতে জুতে নিংড়োতে থাকছেন। এই আর কি!

যাক্, বরাতের ভোগ যা, তা তো হবেই—হ'লও। এত ক'রেও বিয়ের দিনে বর এসে পৌঁছল না। শোনা গেল—বর বরযাত্রী সমেত ট্রেনে আট্‌কা পড়েছেন—কোথায় গোলমাল বেধেছে, আসতে পাচ্ছেন না। মাথায় বজ্রাঘাত—সে বাড়িতে একটা হৈ-হৈ কাণ্ড!

কিন্তু আশ্চর্য!—এত হাঙ্গামার মধ্যেও কন্যাযাত্রীরা ঠিক গলি-ঘুঁজির ভেতর দিয়ে রিক্সা চেপে চেপে এসে পাত পেড়ে খেয়ে গেলেন, শুধু যার জন্যে এত কাণ্ড সেই এসে পৌঁছল না।

শোনা গেল, পথের মাঝ থেকে ট্রেনকে অপর জায়গায় চালান ক'রে দেওয়া হয়েছে, একেবারে নাকি উল্টো দিকে—কবে রেল কোম্পানী মাল ডেলিভারী দেবে তা পরমেশ্বর জানেন।

তিন দিন পরে ধুঁক্‌তে ধুঁক্‌তে বরের দল এসে হাজির। শেষে ভাদ্দর মাসে বিয়ে ঢোকাতে হ'ল।

তারপর মেয়েদের আবার আক্কেল শুনুন। বিয়ের পরের দিন ৭॥০ টার ট্রেনে ওরা রওনা হবে বললে, তা ওঁদের পছন্দ হ'ল না—ঘি-ভাত খেয়ে তবে বর-ক'নে যাবে।

উঃ, কী আপদ বুঝুন! ভালয় ভালয় ট্রাম, বাস, ট্রেন চালু থাকতে থাকতে সবাই বাড়ি থেকে বিদেয় হ'লে তখন বাঁচি, তা নয়—ঘি-ভাত খাবার জন্যে সবাই আটক রইলেন।

বরাতের জোর—সবাই স্বস্থানে পৌঁছলেন তাই, তা না হ'লেই গেছলুম আর কি! আজকালকার ব্যাপার কিছুই তো বোঝবার

উপায় নেই—হঠাৎ একটা ফ্যাসাদ বাধলেই হ'ল। অহিংসভাবে জব্দ করতে হ'লে লোকে বিছানা, বালিশ, খাটিয়াপত্তর লাইনের ওপর পেতে হয়তো দিব্যি ঘুম মারতে শুরু ক'রে দিলে, নয় লাইন উল্টিয়ে ডাকাতি ক'রে গেল। এই সব ঝঞ্চাট সাম্‌লিয়ে একটা বিয়ে দেওয়া কি এ-যুগে সহজ কথা ?



বংশধরের বংশ

জানেন দুর্গতি ? আমার বাড়িতে আর ছেলেপুলেগুলো আমার
তাঁবে নেই। মানে একেবারে যাচ্ছেতাই ক'রে বেড়াচ্ছে।
সবচেয়ে ওস্তাদ আবার ন-বাবুর ছেলে ভুঁটেটা। লেখাপড়া ছেড়ে
দিনরাত রাস্তাঘাটে তার মাতব্বরিতে পাড়ার অপর ছেলেগুলোর
দফা পর্যন্ত হ'য়ে গেল।

এর ঝঞ্ঝাট পোয়াতে পোয়াতে আমি তো পাগল হ'য়ে গেলুম
মশাই ! দুশো লোক এসে রোজ বলবেন, মশাই, ও এই করলে, তাই
করলে, আপনি কিছু বলছেন না—একটু দেখুন ! ইত্যাদি……

আচ্ছা, আমি কি দেখব বলুন তো ? তার পেছনে পেছনে
আমি কাজকর্ম ছেড়ে কি সারাদিন হৈ হৈ ক'রে বেড়াব ?
ভায়াকে ডেকে তাঁর গুণধরের কীর্তির কথা বললুম, কিন্তু কথাটা
বোধ হয় তাঁর বিশেষ পছন্দ হ'ল না, মুখটা হাঁড়ি ক'রে বললেন,
এ বয়সে ছেলেপুলেরা একটু হৈ-চৈ ক'রেই থাকে, সব ছেলেই তো
আজকাল তাই করছে।

আমি বললুম, তা করছে, কিন্তু আমাদের বাড়ির ছোঁড়াদের মত
কেউ করে ? কই, আসল একটা কাজ করতে বললে তো তারা
এগোয় না, শুধু বজ্জাতি ক'রে বেড়ানোর বেলাতেই বুঝি তৈরী ?

যদি জানতুম—হ্যাঁ, সত্যিকারের একটা বড় কাজ করতে তারা

অপর বাড়ীর ছেলেদের মত পেছপাও নয়, তা হ'লে সত্যি পাঁচজনের কাছে মুখ উজ্জ্বল হ'ত ? তা তো না !

কোথায় মিটিং হচ্ছে—তার মধ্যে পাঁচজনকে ঠেঙিয়ে দিয়ে এল। ট্রাম যাচ্ছে—পয়সা না-দিয়ে পেছন থেকে একপাল ছেলে নিয়ে জানলা গ'লে আপনার জামা কাপড়ে এক ধাব্‌ড়া জুতার কাদা দিয়ে ঢুকল, কন্‌ডাক্টারের বাপান্ত করলে, ইন্‌স্‌পেক্টর ঢুকতেই আবার জানলা গ'লে পেছন থেকে নেমে গেল। ট্রেন চলেছে—চেন ধ'রে টেনে খামকা দাঁড় করিয়ে দিলে। কোথাও যাত্রা বা থিয়েটার হচ্ছে, ওদের হয়তো বড় পার্ট দেয় নি—অমনি পেছনে ব'সে কুকুর শেয়াল ডাকতে শুরু ক'রে দিলে। সবাই রাস্তার ধারে হয়তো একটা শোভাযাত্রা দেখবার জন্যে চুপ্‌চাপ্‌ দাঁড়িয়ে আছে—অমনি ভুঁটে পাঁচজনকে ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় খানিকটা বুক চিতিয়ে নিজের কেরদানি দেখিয়ে এল, তার বাপের বয়সী কোন একটি অপরিচিত ভদ্রলোক হয়তো রাস্তা দিয়ে চলেছেন—অমনি পেছন থেকে 'এই যে দাদা' ব'লে টিটকিরি দিয়ে, তাঁর নাম নিয়ে একটু রসিকতা ক'রে আর পাঁচজনকে নিয়ে হো-হো ক'রে হাসতে শুরু ক'রে দিলে। মেয়েরা কোথাও দাঁড়িয়ে আছে—তাদের সামনে যত রকম বাঁদরামি করা যায় তাই ক'রে, রাত আটটায় বাড়ি ঢুকে অন্ন ধ্বংস করতে শুরু করলেন।

আপনি কিছু বলুন, মুখে একেবারে উত্তর যোগানো রয়েছে, বেশ করিচি মশাই, কোম্পানির রাস্তা—যা খুসী করবো। কর বাবা !

আপনি মান বাঁচাতে পথ পাবেন না। এই সব হতভাগাদের নিয়ে আমি কি করব একটা পরামর্শ দিতে পারেন ? ক্রমশ

দেখছি এই বেটাদের জন্যে স্বরাজ ফরাজ ছেড়ে চার্চিলের দলেই ভিড়ে যাওয়া ভাল।

কতবার বলেছি, ওরে, ও-রকম করিস্ নি, তাতে জাতের বদ্‌নাম, বংশের বদ্‌নাম। তা বললে কে শুনছে? আমাকেই কোন্‌দিন আড়ালে বংশ নিয়ে না খোঁচাখুঁচি দিয়ে বসে, সেই ভাবনায় খুব র'য়ে স'য়ে বলতে হয়।

তেমনি হচ্ছেও! মনে করুন এ বছরে গোটা তিনেক মিটিং হ'ল, সব জায়গায় একটা না একটা কিছু ক'রে এসে তার যথেষ্ট ফলও ভুগলে, আবার আমাকেও ভোগালে। প্রথমবার দেখলুম— ছুড়োটার নাক একদম নেই। ভাবলুম, যাক্, একটা হাঙ্গামা চুকল!

দ্বিতীয়বার দেখি, ও মশাই, একটা কান গালের কাছে টিয়াপাখীর দাঁড়ের মত ঝুলছে। বাকী ছিল থুত্‌নি, সেটা সেদিনের দাঙ্গায় খুইয়ে এসেছেন, আপদ চুকে গেছে! তবু তার আক্কেল আছে? মহরমের প্রোসেশন দেখতে বেরিয়ে গেছে।

বাপ মাকে এ সম্বন্ধে বলুন, তাঁরা আপনার ওপরই ক্ষেপে যাবেন। ছেলের গর্বে তাঁরা ভরপূর! কত লোক দেশের জন্যে প্রাণ দিচ্ছে, ও তো মাত্র নাকটা, কানটা আর থুত্‌নিটা দিয়ে এল……এ আর এমন বেশি কি?

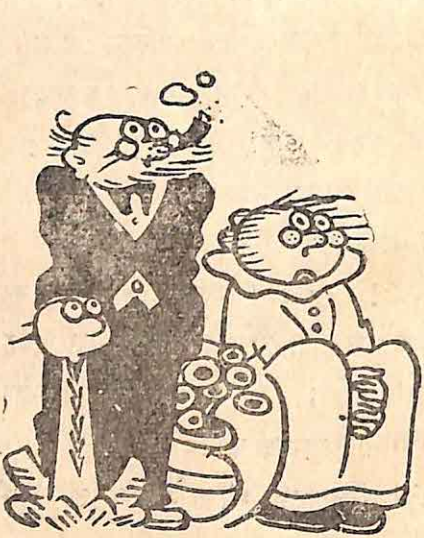
তা তো বটেই! বুঝবেন বিয়ে দেবার সময়। টাকা দিয়ে যেমন মেয়ে পার করতে হয়, তেমনি টাকা দিয়ে ছেলে পার করতে হবে, আমি ব'লে দিয়েছি; তবে তার আগে আমাকে না ভবপার ক'রে দিয়ে আসে—এই হয়েছে ভাবনা।

কাজের ঝঞ্ঝাট নিরুপায় হ'য়ে স মলাতে রাজী আছি মশাই,

কিন্তু এই সব অকাজের ঝামেলা পোয়ানো—এ আমার কুষ্টির বাইরে। লেখাপড়া শিখলি না শিখলি কিন্তু ভদ্রতাটা একটু শেখ, তা না হ'লে মুখে 'বন্দে মাতরম্' আর 'জয় হিন্দ্' ক'রে চেঁচালে কি হবে?

মানুষ হবার সাধনা নেই, কিন্তু ফানুষ হ'য়ে ওড়বার সাধ প্রচুর। তাই আমার মাঝে মাঝে ভাবনা হয় যে, বাপ-মার আদরের তাপে এখন তেতে খুব ধোঁয়া উঠছে বটে, কিন্তু তা ফুরুলে এগুলো হয় চোপ্সাবে—নয়, কেৎরে বে-জায়গায় গড়াবে।

তখন এই জাম্বুবানগুলোর লেজের আগুনে আমাদের গুষ্টির মুখ পুড়বে আর কি! মশাই, পৃথিবীতে ছেলে আনানো একটা ঝঞ্ঝাটের কাজ সত্যি, কিন্তু তার চেয়ে ছেলেকে ঠিকমত বানানো অধিকতর ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার!



শ্রীশ্রী৺সরস্বতী পূজা

উঃ——খুব আক্কেল হ'য়ে গেল মশাই ! মানে, হিন্দু হ'য়ে জন্মগ্রহণ ক'রে এ-যুগে টিঁকে থাকা দেখছি অসম্ভব ! আমি এখন বেশ বুঝতে পারছি, কেন এ দেশের অর্ধেক লোক অন্য ধর্ম গ্রহণ ক'রে বসেছিল। তার একমাত্র কারণ আর কিছু নয় – ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি ! বারো মাসে তেরো পার্বণ—এ তো লেগেই আছে, উপরন্তু আবার এক একটা মোচ্ছব যখন আসে তখন প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে।

এই দেখুন না, সেদিন সরস্বতী পূজোয় আমায় কী ভোগানটাই না ভোগালে ! মরছি কাপড়ের জ্বালায়, ওদিকে মেয়েদের কাপড় রং করার ধূম প'ড়ে গেল। ব্যাপার কি ?—না সরস্বতী পূজোর সময় বাসন্তী রঙের কাপড় ছুবিয়ে পরতে হয়। অতএব মেয়েগুলো —ভাইঝি, ভাগ্নীর দল—থাবা থাবা হলুদ নিয়ে কাপড়গুলোর দফা রফা ক'রে ছাড়লে। কাপড় ছোবানো তো নয়, আমাকে চোবানো—এটা কেউ বোঝে না ! দেখুন না, ত্থ'দিন পরেই সব প'চে থস্‌থস্ করবে। যাও—আবার পাঁচ গজ না আড়াই গজ কাপড় আনবার জন্যে দোকানে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত লাইন দাও।

কাকে বারণ করব বলুন ? সব শেয়ালের এক রা—এই বাজারে সব সাম্‌লানো যায় ? তার ওপর আবার বারোয়ারী,

সে তো মহামারীর ব্যাপার। মানে, এর আদম-সুমারি করতে গেলে থৈ পাবেন না!

বাড়িতে পূজো, মাঠে পূজো, ইস্কুলে পূজো, ক্লাবে পূজো, অফিসে পূজো, মেসে পূজো, দেশে পূজো, এমন কি হাসপাতালে গেছি—সেখানেও পূজো। সব চাঁদা দাও! মা বিদ্যের আরাধনা হচ্ছে। ছেলেগুলো তো এত বিদ্বান্ হ'য়ে উঠেছে যে বাপ-মার একটা কথা শোনে না। পড়ার বইয়ের সঙ্গে কারুর সম্পর্ক নেই, মই লাগিয়ে সেগুলো উঁচু তাকের ওপর তুলে রাখা হয়েছে, পাছে বাবা খপ্ ক'রে একখানা বই টেনে নিয়ে পড়া জিজ্ঞেস করে। পড়তে বললে জবাব মুখস্থ ব'লে দেবে, ইস্কুলে এখন পড়াই দেয় না। মাস্টার মশাইরা নাকি ব'লে দিয়েছেন, সরস্বতী পূজোর আগে কখনও পড়া হয়?

আমি তো দেখছি, পড়া কোন সময়েই হয় না। আমরা ঘড়া ঘড়া টাকা ঢালি আর ছেলেগুলো খালি ইস্কুলে যাবার নাম ক'রে অলি গলিতে ঘুরে ঘুরে চেঁচায় আর জিন্দাবাদ করে—আর আমরা মাঝ সমুদ্রে আরব্য উপন্যাসের সিন্ধাবাদ নাবিকের মত বাণচাল হ'য়ে নাকানি চোবানি খেতে থাকি।

কিছু বলবার তো উপায় নেই। অতএব চুপ ক'রে থাকাই ভাল। আমি অবিরত গাধার মত চাঁদার থলি নিয়ে ঘুরে বেড়াই, পুরুত মশাইরা আর গাইয়ে বাজিয়েরা ছাঁদা বেঁধে গাদা গাদা টাকা নিয়ে যান, আপনারা নেমন্তন্ন পেয়ে আলুর দম পান্তুয়া পরিতোষ সহকারে সেঁটে যান—বাস, সব ঝঞ্ঝাট চুকে গেল।

যা হবার তা তো হচ্ছেই—তবে মা সরস্বতী এবার যা ক'রে

গেলেন তা বহুদিন মনে থাকবে! কথায় আছে—প্রকৃতি কোন-না-কোন সময়ে মানুষের কু-কাজের প্রতিশোধ নেয়। তা দেখলুম, সেটা একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।

মশাই, ছেলেবেলায় পূজোর আগে কবে দুটো নারকেলের কুল খেয়ে ফেলেছিলুম তার জন্য বুড়োবয়সে তিনি আমায় হুল ফুটিয়ে ছাড়লেন। ছত্রিশ টাকা ছ আনা চাঁদা দিতে হ'ল আমার মত লোককে! অথচ আশ্চর্য,—কোথাও দেখলুম না মায়ের প্রসাদের বন্দোবস্ত হয়েছে, একটা দিন যে ছেলেপুলেগুলোকে নিয়ে গিয়ে খাওয়া বাঁচাব তার সুবিধে নেই। সব জায়গায় গান, বাজনা আর আব্—বৃত্তি, পিত্তি পর্যন্ত জ্ব'লে ওঠে!

তাও কি দুটো ঠাকুর-দেবতার নাম শুনবেন?—রামঃ! মা সরস্বতীর সামনেও 'আকাশে চাঁদ ছিল যে', 'ফাঁদ পেতেছে বাঁশবনে' ব'লে সিনেমার গান চলেছে। এসব যারা না জানে, তাদের কোন খাতিরও নেই। গান না-শিখে মনে করুন এঁরা ওস্তাদ। এঁদের মোটরে আনতে হবে, পৌঁছে দিতে হবে, চা পান সিগারেট ঘন ঘন যোগাতে হবে, মা সরস্বতীর চেয়ে বেশি খাতির করতে হবে, দক্ষিণা দিতে হবে অসম্ভব, খোসামুদী করতে হবে মাস দেড়েক আগে থেকে, তারপর এঁরা বাঁশের খেলা দেখাতে আসবেন। ঐ জন্যে মনে করুন পারতপক্ষে আমি এঁদের কাছ থেকে সর্বদা দূরে দূরে থাকি, কিন্তু হ'লে কি হয়? কর্মের ভোগ—ছোঁড়াগুলো দিলে এঁদের ঠিক করবার ভার। পাড়ার ছেলেদের আবদার আমাকে সব ঠিক ক'রে দিতেই হবে, আমার সঙ্গে নাকি অনেক আর্টিস্টের আলাপ আছে—কী ঝঞ্ঝাট বলুন তো?

অথচ ছোকরারা জানে না যে আর্টিস্ট্‌দের সঙ্গে আলাপ থাকা মানে, তাঁরা হয় আমায় কথা দিয়ে তা খেলাপ করবেন, নয় এমন টাকা চেয়ে বসবেন, যা শুনে আমি প্রলাপ বকতে শুরু করব। তবু সবাই নাছোড়বান্দা! অগত্যা বেরুতে হ'ল।

গেলুম একজনের কাছে। তিনি বললেন, তাঁর এমনি বায়না নেওয়া আছে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এগারো জায়গায়, আর একবারটি পাঁচ মিনিটের জন্যে ঘুরে-আসার তাগিদ আছে একুশ জায়গায়, অতএব তিনি দুঃখিত।

দুঃখের পর সুখের আশায় গেলুম আর একজনের কাছে। তিনি বললেন—তিনি আসতে পারেন, কিন্তু কখন তার ঠিক নেই। তাঁকে একান্ন টাকা আগাম দিয়ে যেতে হবে, তারপর তিনি ভোর পাঁচটাতেও আমাদের ঘুম থেকে তুলে গান শুনিয়ে চ'লে যেতে পারেন, কিম্বা রাত বারোটা সাড়ে বারোটা নাগাদ সবাই ঘুমবার পর একবার ঘুরে যেতে পারেন। অজস্র ধন্যবাদ দিয়ে সেখান থেকে সোজা চ'লে এলুম। ইতিমধ্যে কলকাতা প্রদক্ষিণ হ'য়ে গেছে—এখন চব্বিশ পরগণায় ঘুরছি।

আর একটি শিল্পীর দরজায় গিয়ে দাঁড়ালুম। তিনি শুধু একটু মনোমোহিনী হাসি হাসলেন, বুঝলুম, এই জন্যেই এঁর ছাত্রীর অভাব হয় না। তিনি বললেন—পূজোর পরদিন হয় না?

বুঝলুম আশা নেই। শেষে এক হুলোকে ধরলুম, মানে বৈঠকী গাইয়ে আর কি—এ্যাঁও ম্যাও ছাড়া যাঁর একটা বর্ণ বোঝা যায় না। যাই হোক, ইনি তো আর মেয়ে-মজানো গায়ক নন, বেশ সোজাসুজিই গম্ভীরভাবে কথা বললেন। তিরিশ টাকা নেবেন,

সঙ্গে দু'জন তানপুরো বাজিয়ে যাবেন, দশ টাকা ক'রে প্রত্যেকে, একটি তবলচি—তাকে গোটা পনেরো দিলেই চলবে, গাড়িটা পাঠালেই ভাল, নয় ট্যাক্সি ভাড়া দিয়ে যেতে হবে ; আর কোন বালাই নেই, শুধু একটু তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিতে হবে, বেশিক্ষণ বসতে পারবেন না !

কাল সব ঠিক করব ব'লে সেখান থেকে স'রে পড়লুম। ছোঁড়াগুলোকে ডেকে বললুম, ওরে বাবা, তোরা সব কেত্তন দে, এসব ঝামেলার দরকার নেই। কম পয়সায় অনেকক্ষণ ধ'রে হবে।

একালের ছোকরারা আমরা কথা শুনবে ? ঠিক একে ধ'রে তাকে ধ'রে প্রোগ্রাম করলে। নতুনত্ব কিছু নেই, সেই দেখনহাসির দল আসবে ঠিক ক'রে এল। ঠিক করা তো নয়, আমার সব বেঠিক হ'য়ে যাবার উপক্রম ! আরও চাঁদার হার বাড়লো, কারণ এদের আনতেই হবে, যত টাকা লাগে। ও-পাড়ার ছেলেরা সেবারে নিয়ে গেছলো আর আমরা না-আনতে পারলে এবারে আমাদের মান থাকবে ?

বুঝুন !

এঁদের মান রক্ষা করতে গিয়ে আমার প্রাণ থাকে না, অতএব দাও টাকা ! কি আপদ বলুন তো ?

ইতিমধ্যে মান গেলও। ছেলেরা মায়ের কাছে নালিশ জানিয়ে এলেন, দুর, দুর, বাবার জন্যে পাড়ায় আর মুখ দেখানো যায় না, এই সকলের সঙ্গে এত আলাপ, এত বন্ধুত্ব, কিন্তু কাজের সময় একজনকে আনতে পারে না !

তাদের মা তো ? আমার একটা খুঁত পেলে হয়। তিনি

তক্ষুণি ব'লে উঠলেন, তোরাও যেমন, ওঁর ওপর আবার কেউ কোন কাজের ভার দেয় ? উনি আবার একটা মানুষ যে, ওঁর খাতিরে সবাই হুড়্মুড়্ ক'রে ছুটে আসবে ? সব ঠিক ক'রে এলেও দেখবি বাঁয়া তবলা হয়ত এসে পৌঁছল, কিন্তু গাইয়ে এল না। তার চেয়ে তোরা নিজেরা যা পারিস্ কর।

তাই তারা করলে। ডবল চাঁদা নিলে, কিন্তু প্রোগ্রামের একটা লোকও এসে পৌঁছল না—লোকে এই মারে তো এই মারে। রাত্তিরে সে কী হাঙ্গামা মশাই—শেষে আমি পটলা, খেঁদি, ভুঁটেকে ধ'রে 'ধন ধান্যে পুষ্পভরা' আর 'কদম কদম বাঢ়ায়ে যা' কোরাস্ গাইয়ে যা হোক ক'রে ঝঞ্চাট সামলাই।

কাপড়ের ফাঁপর

দেখুন, কথা আমার কানে সবই আসে। আপনারা আমার ঝঞ্চাট নিয়ে মস্করা করেন, সে কি আমার জানতে বাকী আছে ভাবেন ? টিপ্পনী সবই শুনি। অর্থাৎ মোদ্দা কথাটা আপনারা বলতে চান যে, ভীমরতি যাদের ধরে, চিতায় না উঠলে আর তাদের ঝঞ্চাট কাটে না—এই তো ?

কিন্তু এখন চিতায় ওঠাও যে ফ্যাসাদ! ঘাট-কাপড়ের ঝঞ্চাটটা সামলাবে কে ? বলে জ্যান্তলোকের জন্যে কাপড় পেতে হিম্‌সিম্ খেতে হচ্ছে এখন ম'লে কাপড় পাওয়া যাবে ? তা হ'লে আর ভাবনা ছিল না। সম্প্রতি এক বুড়ী দিদিমাকে ঘাটে নিয়ে গিয়ে খুব আক্কেল হ'য়ে গেছে !

আপনাদের কি বলুন না—দয়াময় পয়সা যোগাচ্ছেন, তাই এই বাজারেও দিশি তাঁতের বাহার দেখিয়ে, ফিন্‌ফিনে জামায় গিলের কেরামতী ক'রে বুড়ো মদনমোহন হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু আমাদের তো আর তা নয় ?

রীতিমত সকাল আটটার সময় আপিস কামাই ক'রে ঠিক দুপুর বেলা পর্যন্ত লাইনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি, আবার দোকানী খেতে গেলে আধ ঘণ্টার মধ্যে বাড়ি থেকে ঘুরে এসে, ও-বেলায় যাতে গোড়ার দিকে দাঁড়াতে পারি, তার জন্যে হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটে আসছি। তা

না হ'লে তো দোকানের চৌকাঠে পৌঁছবার উপায় নেই! কিন্তু যে-দেশে বাস করি—এখানে আমার স্বদেশবাসী কাউকে নির্ঝঞ্ঝাটে দাঁড়াতে দেবে? পঞ্চাশজন পেছনে ঠেলছে আর দুশোজন সামনে ব্যূহ রচনা ক'রে দাঁড়িয়ে আছে; তা'র ফাঁকে হিতোপদেশের বানর ও কীলকের অবস্থায় চিঁড়েচ্যাপ্টা হ'য়ে দাঁড়াতে পারেন, দাঁড়ান!

তাও কি ভাল ক'রে দাঁড়াবার সুবিধে দেবে ভাবছেন? একেবারে গায়ে পিঠে সেঁটে ধ'রে থাকবে। বুড়ো বয়সে, উঃ, কী কর্মের ভোগ! এ এক মহা ঝঞ্ঝাট!

মশাই, সেদিন দোকানের লাইনে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় এক বুড়ো এসে মারলেন আমায় ধাক্কা। কি আপদ বুঝুন! পরে এসে আগে যাবেন। প্রতিবাদ ক'রে উঠতে খিঁচিয়ে ব'লে উঠলেন, আমি ঠিক নিজের জায়গায় হিসেব মাফিকই যাচ্ছি!

আমি বললুম, হিসেব মাফিক কি মশাই? তিনি চীৎকার ক'রে ভেংচে ব'লে উঠলেন, আজ্ঞে! বড্ড মাথার ওপর রোদের তেজ লাগছিল, তাই এই জায়গা থেকে স'রে ও-ফুটপাতের ছায়ায় এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলুম, এখন রোদটা সরতে এসেছি, আপনার ওপর বরাবরই নজর রাখা হয়েছে।

আমি তো তাজ্জব! আমার ওপর নজর কি রে বাবা! পরে বুঝলুম, আমার সামনের জায়গায় বুড়ি ছুঁয়ে একবার কোন্ ফাঁকে উনি রিজার্ভ ক'রে গেছেন, তার পর ফাৎনার ওপর চোখ রেখে যেমন মাছ-ধরিয়েরা ব'সে থাকে, তেমনি উনি ও-ফুটপাতে ব'সে আমার অবস্থানের প্রতি লক্ষ্য রেখে দোকানে ঢোকবার টোপ

ফেলছিলেন। এখন ছায়া পড়েছে দেখে হাজির হয়েছেন। এই নিয়ে কি এখন ইস্কুলের ছেলেদের মত ঝগড়া করব? সারাক্ষণ চাঁদিতে তাত যা খাবার তা তো খেলুম, সূর্যিদেব পর্যন্ত শেষ বরাবর



মনে করুন কেৎরে আমার কান মুচড়ে লাল ক'রে ছেড়ে দিয়ে স'রে পড়লেন, তবু আমি লজ্জায় স'রে আসি নি—উনি এখন ও-ফুটপাত ছেড়ে এলেন ঠাণ্ডা ভোগ করতে! কী আক্কেল একবার ভাবুন!

আবার এই নিয়ে তর্ক, কত হিসেব দেখানো, কত অঙ্কের কেরামতি—কবে তিনি সরকারের অডিটার ছিলেন, লাটসাহেবের গলদা চিংড়ির বিল কেটে দিয়েছিলেন ইত্যাদি কত কথা!

তর্ক করলে তো আর তার শেষ নেই, নীরবে অত্যাচার স'য়ে ঘড়ির তারিখের কাঁটার মত এগোতে এগোতে রাত্তির আটটা আন্দাজ দোকানের দরজা বরাবর পৌঁছলুম। কিন্তু বরাত এমনি, তিনি ঢুক্‌তেই দরজা বন্ধ হ'য়ে গেল। সেদিন আর দোকানীর সময় নেই—আমাদের প্রচুর সময় কিনা? তাই আবার আসছে হপ্তায় রেশনের দিন এস! আবার আফিস কামাই কর! তারপর ঝড়তি পড়তি যা মাল থাকবে নিয়ে যাও, আর বাড়িতে মেয়েদের মুখ-ঝাম্‌টা খাও, 'ম্যাগো ম্যা! এ কী সব কাপড়, না, বালিশের খেরো, দুটো চোখ ব'লে জিনিস নেই গা?

বলুন, এ-সব র্‌যাঁদা-বুলোনো কথা শুনলে রোখ চেপে যায় কি না? বাড়ির মধ্যে ব'সে খ্যাঁদা নাক নেড়ে নেড়ে এদের আর সমালোচনার অন্ত নেই, কিন্তু কি ক'রে যে সংসার-তরণীর হাল ধ'রে আছি সেটি কেউ বুঝবেন না। শুধু আমার চোখ মুখ নাকে খোঁচা দিয়েই এঁরা ঝাল মিটোচ্ছেন।

মানে, যুদ্ধের আগে সব ভালো ভালো দু'টাকা আড়াই টাকা জোড়ার মিলের শাড়ী পরিয়েছি, এখন ছ'টাকা দামের মোটা কাপড় পোষাবে কেন? আর, তা ছাড়া, দিলেও কি বুঝবে? ব'য়ে যাচ্ছে!

তা না-হ'লে, দুদিন আগে পর্যন্ত এই নিয়ে নয়-ছয় করেছেন এবং এখনও সুবিধে পেলেই করেন। মাস দেড়েক আগে এই

নিয়ে তো মাথা ফাটাফাটি হবার উপক্রম! মশাই, পুরোনো কাপড়গুলোকে কেটে কেটে বাড়িতে লুঙ্গীর মত পরব ভাবলুম, কিন্তু তার একখানার পাত্তা পেলুম না। জিজ্ঞেস করলুম, হ্যাঁগা, ছেঁড়া কাপড়গুলো গেল কোথায়?

গিন্নী নির্বিকার চিত্তে ব'লে দিলেন—বাসন-উলীকে সতেরো-খানা কাপড় দিয়ে খোকার জন্য একটি অ্যালুমিনিয়মের বাটী কিনেছেন। আচ্ছা, এতে কি বলতে ইচ্ছে করে বলুন তো?

বুঝুন, এঁদের ওপর বিশ্বাস ক'রে সংসারের যথাসর্বস্ব ছেড়ে দিয়ে আমরা আপিস করতে বেরুই। বাকী ছু-একখানা যা পড়েছিল তাতে গিন্নীর এক ভাইঝির তিনখানি কাঁথা হয়েছে শুনলুম। এ ক্ষেত্রে কি করব আমায় শুধু ব'লে দিন। মানে, এরা একেবারে উঠে প'ড়ে লেগেছে আমাকে সংসার করতে দেবে না। বুদ্ধদেব, শ্রীচৈতন্য সকলে যে এক বস্ত্রে গৃহত্যাগ ক'রে সট্‌কে-ছিলেন, তার একমাত্র কারণ আমার মনে হয় তাঁরা আগে থেকেই এই সব ঝামেলার আঁচ পেয়েছিলেন। আপনারা হয়তো বলবেন, এতই যদি বুঝেছ, তাহ'লে তুমিও তাই কর না কেন? করতুম, কিন্তু বড্ড বিলম্বে অনুভূতিটা হচ্ছে। তবে সত্যি বলছি, আর ছু-চারদিন দেখব, তারপরই 'বাসাংসি জীর্ণানি' ক'রে সট্‌কাব।

বাড়িতে এসব কথা বলার তো জো নেই, উল্টে তর্ক করবে। মানে, যা দেখছি এঁদের কাপড় যোগাতে গিয়ে আমায় কাপড় ছেড়ে পালালেই ভাল হয়। তাও তো মশাই ছেড়ে ছিলুম! কদিন পেণ্টুলুন প'রে ঘুরে বেড়ালুম, কিন্তু তাতে দেখলুম আরও বিপদ!

একবারে অনভ্যাস—অর্ধেক সময় কসির দড়ি খুলে যায়, মুঠো

ক'রে পেন্টুলুন ধ'রে লোকের সঙ্গে ভয়ে ভয়ে কথা কই, আর লোকে ভাবে সর্বদা বুঝি আমার পেট কামড়াচ্ছে—সে একটা যন্ত্রনা ! ব'সে সুখ নেই, চিৎ হ'য়ে সুখ নেই, ভদ্রসমাজে দাঁড়িয়ে একটু শান্তিতে কথা কইবার জো নেই, কেবল মনে হয় এই বুঝি সর্বস্ব নীচের দিকে নেমে গেল ! কি ঝঞ্ঝাট বুঝুন ।—

নেমন্তন্ন

পৃথিবীতে যাবতীয় ঝঞ্ঝাটের মধ্যে নেমন্তন্ন রক্ষা করার চেয়ে বেশি সামাজিক ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার আমার তো মশাই জানা নেই, বিশেষতঃ বাঙালীর বাড়ি। কিছুদিন আগে আমার এই কার্য সম্পন্ন করতে যাবার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য হয়েছিল এবং সেখানে গিয়েই এবার বেশ ভাল ক'রে বুঝলুম যে, কী সংঘাতিক ব্যাপার এই নেমন্তন্ন পাওয়া ও ততোধিক সাংঘাতিক ব্যাপার বহাল তবিয়তে খাওয়া।

প্রথমতঃ ধরুন, যৌতুক বা উপহার বা আর কিছু ভদ্রতার খাতিরে দিতেই হবে, সে এক ফ্যাঁসাদ। মেয়ের বিয়ে হ'লে যা হোক একটা কিছু না দিয়ে বেশ খেয়ে দেয়ে চ'লে এলেন, কিন্তু ছেলের বিয়ে, ভাত, উপনয়ন ইত্যাদিতে করবেন কি বলুন তো? মুখ জুবড়ে খেয়ে মান-খাতির রাখার জন্যে অন্ততঃ দুটো টাকাও তো যাবে? কিন্তু আপিসে তো আর নেমন্তন্ন-এলাওয়েন্স দেয় না। অথচ বাঁধা রোজগারের মধ্যে এসব আসে কোত্থেকে? উপহারের ফেউ তো লেগেই আছে, একি রে বাবা! সর্বকার্যে দাও আর দাও! জন্ম থেকে শুরু ক'রে যতক্ষণ না শ্রাদ্ধ গড়াচ্ছে, ততক্ষণ ভদ্রতা বজায় রাখতে শুধু বিলিয়ে যাও!

অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্ন, টাকা দাও—নিদেন একটা ঝুমঝুমি; বৌ-ভাতের খাওয়া, অতএব শুধু হাতে কি বৌমার মুখখানি একবার গালটি উঁচু ক'রে দেখে আসবে—অন্ততঃ গোটা দুই তাঁর হাতে

দিয়ে তারপর মা-লক্ষ্মীর মুখের দিকে চেয়ো, তোমার মুখখানি তাতে পেঁচার মত হোক না, ক্ষতি কি !

সেজ পিসীর ন' জায়ের ভাসুরঝির সাধ, গিন্নীর নেমন্তন্ন হয়েছে, তবে আর কি ? তাঁর যাবার সময় এক থালা সন্দেশ আর একখানা তাঁতের শাড়ী যোগাড় ক'রে সঙ্গে দিয়ে দাও। পূজোয় নেমন্তন্ন, প্রণামী নিয়ে এগোও। বড় কাকার শ্বশুরের শ্রাদ্ধ, নেমন্তন্ন ক'রে গেছে, তাঁর দুই ছেলেকে দুটো থান কাপড় না দিলে সেটা কি ভাল দেখাবে ?

রেগে-মেগে যদি বলেন, দোব না—না দিলেন, কিন্তু ভদ্রসমাজে চলাফেরা করতে হবে তো ? তা যদি করতে চান, তা হ'লে পার পাচ্ছেন কি ক'রে ? না করেন, লোক দু'দিন পরে মুখ দেখবে না।

যদি বলেন, অপর জাতের মধ্যে বাবা এত নেই। খোঁজ নিয়ে দেখুন, সেখানে এইগুলো নেই বটে কিন্তু জন্মদিনের উপহার, বিয়ের বাৎসরিক, প্রেমের জয়ন্তী ইত্যাদিতে জিনিস যোগাতে যোগাতে ফতুর হ'য়ে যাবেন। তাও যদি না দেন, তাহ'লে পার্টি দিতে দিতেই জান নিক্‌লে যাবে। কিছু নিজে না দেন অপরে চাঁদার খাতা নিয়ে আপনাকে তাড়া করবে। তাতে সই না করেন কেউ কিছু মুখে বলবে না এটা ঠিক, তবে আড়ালে যা বচন প্রয়োগ করবে তা কানে পৌঁছলে মনে হবে আত্মহত্যা ক'রে ফেলি। আমি লিখছি এই সব তো—শুনুন কত লোক আমাকে কী না বলতে বাকী রাখছে ! কিন্তু বলি কেন সেটা কেউ বোঝেন না, এই দুঃখ মনে রয়ে গেল।

আমাদের নেমন্তন্ন করা কেন তাই ভাবি। একটা ভাল জামা কাপড় প'রে যে বেরুবো তার ব্যবস্থা কই? সবে ধন নীলমণি দুখানি তাঁতের কাপড় ছিল, তা তো বস্ত্রাভাবে বাধ্য হ'য়ে আফিস যাওয়ার সময় ব্যবহার ক'রে ক'রে ক্ষইয়ে ফেলেছি, এখন উপায়? পারমিটে তো পাঁচ গজ মার্কিন কিংবা ধুতি প্রাপ্য, তার কোন্‌টা আনি বলতে পারেন? সকাল বেলায় পুরনো মালই না-হয় কেচে-কুচে ধোপ-দোরস্ত করা গেল, তারপর রাস্তা? সেখানে কর্পোরেশনের কাদা-ভর্তি গর্ত সামলে শুভ্রবেশে কোথাও যাবার জো আছে? সব্বার বাবা তো আর মোটরের বন্দোবস্ত ক'রে যান না, অধিকাংশ বংশধরের ভাগ্যে যা জোটে তাতে তো রাস্তায় চিৎ হ'য়ে শুয়ে পড়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না, অতএব এই পুঁজি নিয়ে লোকের বাড়ি যাওয়া যায় কি ক'রে বলুন? মাটি একটু ভিজলে তো আর কথাই নেই! যে কোন মোটর-আরোহী তো কাদার পিচকারী ছিটিয়ে চ'লে গেলেন—কাপড় গুটিয়ে নয় পোষাকের তলার দিকটা সামলালেন, কিন্তু ওপরের দিকের অবস্থা যে বিচিত্র পাতা-বাহারি হ'য়ে গেল, সেটার খোঁজ রাখেন?

যদি বলেন, একটা ছাতি নাও না কেন? কিন্তু বাড়িতে যেটি আছে সেটির যে ছাত নেই, সেণ্ট্রাল এভিনিউর মহাজাতি-সদনের মত তার অবস্থা! শুধু বাঁটটি হাতে ক'রে তো আর রাস্তায় ঘুরে আসা যায় না? তা ছাড়া, নেমন্তন্ন-বাড়িতে গিয়ে পাতার ব্যবস্থা করবেন, না, ছাতা সামলাবেন? কাদামাখা জুতো জোড়াটি নিয়ে তো বেড়ালের মত আবার খাবার সময় কোলে ক'রে রাখতে হবে, না রাখেন তো খালি পায়ে বাড়ি ফিরে আসুন! হয়তো বলবেন,

আজকাল অনেক বাড়িতে টেবিল চেয়ারের ব্যবস্থা হয়—তাহ'লে তো আরও বিপদ! এক ইঞ্চি টেবিল, যেখানে বারোজন বসিবেক ব'লে লিখে দেওয়া উচিত, সেখানে একাত্তর জনের পাতা পড়েছে, এর গেলাসের জল ও খাচ্ছে, ওর দইয়ের ভাঁড় পাশের লোক ভুল ক'রে টেনে নিচ্ছে, ইতিমধ্যে টেবিলে বসতে গিয়ে তিন জায়গায় পেরেকের খোঁচা লেগে কাপড় গেছে—এই তো ব্যবস্থা!

তারপর খাওয়া তো পরের কথা, পাতের কাছে যাওয়া কি ঝঞ্ঝাট বলুন তো? গান হোক, বাজনা হোক 'এইবার গা-তুলুন সকলে' বলতে না বলতে কে যে কোথায় ছুটবেন তার ঠিক ঠিকানা আছে? সে এক দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার! সবাই ছাতের দিকে সমবেতভাবে ওঠবার চেষ্টা করছেন অথচ পারছেন না—ত্রিশঙ্কুর মত সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে! দৌড়ে ঠেলে না ওঠেন, তাহ'লে প'ড়ে থাকুন তিথ্যির কাকের মত আর এক ঘণ্টা—ভদ্রতায় বাধলে এ ছাড়া উপায় নেই জানবেন। তারপর যে পাতায় খেতে বসবেন সে যে কী ভাবে পদ-দলিত হ'ল তা যদি জানতেন! আমার সামনে এক ভদ্রলোক দেখি একটি কোণে দুটি পাত আগলে, হাত দিয়ে চেপে ধ'রে চীৎকার করছেন, গোপলা, ভূতো, চ'লে আয় শিগ্‌গির, লোক এসে পড়ল ব'লে। পেছনে ধাক্কার চোটে আমি তখন উঠে পড়েছি। সে ভদ্রলোকের পাশে যেতেই তিনি আমায় কনুয়ের গুঁতো মেরে ব'লে দিলেন, এটি রিজার্ভ, ও-দিকে যান। বাধ্য হয়ে তিন হাত দূরে গিয়ে বসলুম। ও-দিকে গোপ্‌লা ভূতোর প্রবেশ—পায়ে 'শু'; তাদের ফিতে খুলতে দেরী হচ্ছে দেখে ইনি ক্ষেপে গেলেন, চীৎকার ক'রে ব'লে উঠলেন, বাঁদররা ঐ শুদ্ধু চ'লে আয়,

কে তোদের জুতো খুলতে বলেছে ? তাঁর হুঙ্কারের চোটে গোপ্‌লা ভূতো অতি সপ্রতিভভাবে সামনের গোটা কতক কলাপাতার ওপর দিয়েই মস্ মস্ ক'রে হেঁটে চ'লে এল।

পরে যাঁরা সেই পাতে বসলেন তাঁরা পটল ভাজা একটু বেশী দোমড়ানো দেখে বোধ হয় ভাবলেন যে, কাজের বাড়ির নানান চাপে বোধ হয় পটলেরও এই দুর্দশা হয়েছে! হায়, যদি একটু আগে সে দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য তাঁদের হ'ত!

ইতিমধ্যে একতলা থেকে তেতলার সিঁড়ি ভর্তি লোক দাঁড়িয়ে, তাঁরাও ওঠবার জন্য বদ্ধপরিকর আর নিমন্ত্রণ কর্তারাও তাঁদের ঠেলে আবার নিচে পাঠাবার জন্য কৃতসঙ্কল্প, সে এক গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ! একবার কানে এল এক ক্রুদ্ধ বাজখাঁই আওয়াজ, বলছি আর জায়গা নেই তবু ঠেলাঠেলি করবেন, আশ্চর্য, যান নীচে গিয়ে বসুন গে!—উঃ, কি সুমধুর আপ্যায়ন! তবু নেমন্তন্ন খেতে হবে—লজ্জা নেই! বাড়িতে যে খাবার বন্ধ ক'রে আসা হয়েছে! হায় কপাল! যাক্—এ পর্বের পর ভোজনপর্ব! পান্তুয়ার রসের সঙ্গে ঘাম একসঙ্গে মিলিত হ'য়ে টপাটপ পড়ছে আর লোকে গপাগপ সেঁটে চলেছে, এর মধ্যে আবার নিরিমিষ্যির বায়না আছে, পাতে মাছ পড়লে খাওয়া নষ্ট। আশ্চর্য, এত দেখে শুনেও এঁদের জাত রক্ষা হয়—এইটেই তাজ্জব ব্যাপার! কিন্তু এই সব পুরুষ-বিধবারা যদি জানতেন যে কুমড়োর ছোকা, আলু-পটলের ডালনা, মাছের খুরি ক'রেই চালান দেওয়া হচ্ছে, তাহ'লে বোধ হয় আর এত ঝঞ্ঝাট পোয়াতে আসতেন না।

বিংশ শতাব্দীর সংসার-যাত্রা

ছেলেবেলায় যাত্রা দেখতে ভাল বাসতুম, এখন যাত্রার আসরে নিজেই নেমে প'ড়ে দেখছি জিনিসটা যত সহজ মনে করা গিয়েছিল আসলে তা নয়। যাত্রার সেরা সংসার-যাত্রা, তাও একটা বড় পার্ট দিলে হয়তো কায়দা-কানুন দেখাতে পারতুম, কিন্তু মোগল-সৈন্য সেজে সেজে যে প্রাণ যায় দাদা ! রাজা, উজীর, রাণী, অমাত্য সবাই তবু সিংহাসনে বা তার আশেপাশে একটু বসতে পায়, কিন্তু খিদ্‌মদ্‌গারী করবার জন্য সৈন্য-বেটার আর ছুটোছুটির কামাই নেই ; আমার হয়েছে সেই অবস্থা—এটা কর, সেটা কর, বাজার যাও, মেয়ের বিয়ে দাও, ভাগ্‌নীর ফুলশয্যের তত্ত্ব সাজাও মারপিট দাঙ্গা কার্‌ফিউ যাই হোক না কেন—তুমি ঠিক রাস্তা বেছে ঘুরে বাড়িতে জিনিস-পত্র নিয়ে এস : ছেলেকে পড়াও, কয়লার যোগাড় দেখ ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আপনাদের কল্যাণে এ কার্য করা কি সোজা কথা ?

আপনাদের ধর্মঘট আর ঘন ঘন মারপিটের জন্যে তো হেঁটে হেঁটে প্রাণ গেল। অর্ধেক রাস্তায় গাড়ি চলে না, মাত্র দুটি-ঠ্যাংয়ের ভরসায় কত দিন দেহ রক্ষা করা চলে আপনারা একটু জ্যামিতি ক'ষে যদি বুঝিয়ে দেন তো বড় বাধিত হব। তারপর বাজার আনব কি—দোকানপাট তো অর্ধেক দিন বন্ধ, আজ বিস্যুৎবার, কাল বিক্রয়-করের প্রতিবাদে হরতাল, পরশু দোকানের সামনে

হাতাহাতি, তরশু চিনি পাওয়া যাচ্ছে না ব'লে ঝাঁপ বন্ধ, তা হ'লে আমি করি কি ? আপনারা তো তালা ঝুলিয়ে চ'লে গেলেন, কিন্তু এদিকে বাড়িতে যে কান ঝালাপালা হ'য়ে গেল মশাই ! ছাপ্পান্নটি 'হাঁ' কাকপক্ষী ডাকবার আগে খাবারের জন্য হাঁই হাঁই করছে, কিন্তু আমি জিনিস পাই কোথায় বলতে পারেন ? আপনারা বলবেন পয়সা দিলে সব পাওয়া যায়, সে আমিও জানি—পয়সা দিলে বাঘের দুধও মেলে, তার বেশি পয়সা থাকলে অন্তঃপুরের মহারাণীকে টাকা ধার দিয়ে তাঁর কাছ থেকে সুদ আদায় করা যায়, কিন্তু আমার ট্যাকে যা থাকে তা নিয়ে যে তিনপাক এগিয়ে পাঁচপাক পিছিয়ে আসতে হয়, এই তো দুঃখু ! একখানা পাঁউরুটি আনব তা সেখানে হাঁউ-মাউ-খাঁউ ক'রে তিন শো লোক এমন ক'রে উঠল যে সেখান থেকে পালাবার পথ পাই না। আচ্ছা, তাহ'লে আমি সকালে 'হাঁ'গুলোকে বন্ধ করি কি দিয়ে ?

যদি বলেন—একটু হালুয়া ক'রে দিতে পার না ? যে আজ্ঞে, এবার থেকে তাই দেবো, দয়া ক'রে যদি আপনার চিনি বরাদ্দটা আমায় দিয়ে দেন তাহ'লে নয় চেষ্টা দেখি। আপনাদের পয়সা আছে, ভাবনা কি ? কিন্তু সবার তো সে ভাগ্যি নয় ! আমি একটু চা খাবার চিনি পাই না, অথচ আপনাদের তো দেখি বারোমাসে তেরো পার্ব্বণ চলেছেই ! বিয়ে, বৌভাত, অন্নপ্রাশনে সন্দেশ পান্তুয়ার ঘটা দেখলে তো মনে হয় না যে, আপনারা কখনও জেনেছেন যে অভাব কাকে বলে ! খাবার দোকান বন্ধ থাকলেও তো দেখি দিব্যি আপনারা সানাই বাজিয়ে ভূরি ভোজনের আয়োজন করছেন, অথচ আমি পাড়ার দোকানে ছোট্ট একটা

কাঠের ফাঁক দিয়ে দু' আনার দুটো গুঁজিয়া কিনতে গিয়ে ঝঞ্ঝাটে প'ড়ে গেলুম!

মশাই, সে একটু ফাঁক ক'রে আমায় কিছু দিয়েছে কি না দিয়েছে অমনি তাকে সকলে মিলে এমন তাড়া দিলে যে পয়সা গুঁজিয়া সেই ফোঁকরের ওধারেই র'য়ে গেল, মাঝ থেকে দড়াম্ ক'রে দরজাটা টেনে দিয়ে দিলে সে আমার আঙুলটা চিম্‌টে। যন্ত্রনায় মরি, তার ওপর ঘরে বাক্যি যন্ত্রনা—যেমন আমার আক্কেল ঠিকই হয়েছে—যেখানে সেখানে যেমন হাত ঢোকাতে যাওয়া। বুঝুন—আমি যেন দিবা রাত্তির ঐ ক'রেই বেড়াচ্ছি।

অথচ এটা কেউ বোঝে না যে লোকের জুতো, লাথি, ঝাঁটা যা-কিছু খেতে হচ্ছে সব এঁদের জন্যেই! সাধে শঙ্করাচার্য বলেছিলেন 'কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ' মানে তোমার কান্তাই বল আর তোমার পুত্রই বল—সব কাস্তের সমান, পেলেই কোপ দেবে অতএব বাপু আর সংসারে ঢুকো না, সব কিছু চেপে যাও! কিন্তু চাপতে পারি নি, এখন এঁদের চাপের চোটে বাপ্ বাপ্ কচ্ছি!

ঋষিবাক্য না শুনে দেখুন কি হচ্ছে! সংস্কৃতে না লিখে ভদ্রলোক যদি ইংরেজিতে ঐ বয়েদটা লিখে যেতেন, তবু প'ড়ে একটু আক্কেল হ'ত মানেও বুঝতুম, বিশ্বাসও জন্মাত, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তা কি কেউ বুঝিয়ে দেবার লোক ছিল?

ইতিমধ্যে আবার 'নোকের ওপর নোক্‌কুনি,' ভূতির বিয়ের জের মেটে নি, ফুলশয্যের তত্ত্ব পাঠাতে হ'ল। আমায় হাজার বার বাজারে যেতে বলেছিল; আমি স্পষ্ট ব'লে দিলাম, 'মাপ কোরো, ও কম্ম আমার দ্বারা হবে না। কুমড়ো আর করলা ছাড়া বাজারে

কিছু পাওয়া যায় না।' কিন্তু তা ব'লেও ফ্যাসাদ, সবাই একসঙ্গে ব'লে উঠলেন, একটা ভাগ্নীর বিয়ে, পয়সা দিয়ে না হোক একটু গতর দিয়ে মামারা সাহায্য করতে পারেন না? কি সবার রাগ!

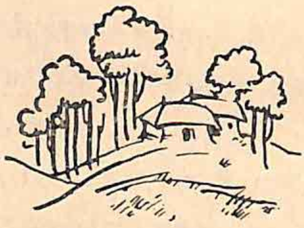
বাধ্য হ'য়ে বেরুলুম। শহরে কিছু নেই, শেষ পাঁড়াগাঁয়ে গিয়ে পাঁচগুণ দিয়ে জিনিস আনি। তাতেও কি মুখ ভেট্‌কানি! ম্যাগো মা, এসব কি মানুষ মানুষকে দেয়? এদিকে শহরে থেকে মরছেন সব দিক দিয়ে, তবু পাড়াগেঁয়ে ব'লে নাক সেট্‌কাতে কেউ ছাড়বে না—কি আপদ বলুন তো?

যাক্, যা পাওয়া গেল তাই তত্ত্ব ক'রে পাঠানো হ'ল, কিন্তু মজা দেখুন যে-অজ পাড়াগাঁয়ে সেগুলো চালান গেল, সেইখান থেকেই আবার সব ফেরৎ চ'লে এল। বরের বাড়ির তত্ত্ব পছন্দ হয় নি। দোষ পড়লো আমার ওপর, সকলে বললে—এ যে হবেই তা তো জানা কথা।

এর প্রতিকার কি বলুন? পাড়াগাঁয়ের লোক—হর্‌দম্ সিনেমা দেখছে, তাদের পছন্দও ঘন ঘন বদ্‌লাতে শুরু করেছে—সেটা কেউ ভাবে না, সব দোষ আমার!—শুনলুম তো তাদের ভূতিটাকেও পছন্দ হয় নি; তার জন্যেও নাকি দায়ী আমি, যেহেতু দোকান পত্তর বন্ধ থাকায় মেয়ে-পালিশ করার মালপত্তর যোগাড় ক'রে আনতে না পারায় ভূতিকে তেল-জব্‌জবে হ'য়েই যেতে হয়েছে। কিন্তু আসলে বর তাতেও সন্তুষ্ট হ'ত না, আমি বাসি বিয়ের দিনে সবার ধরণ-ধারণ দেখেই বুঝেছি। বেয়াই চান নগদ, আরও কিছু বোধ হয় দেনাপত্তর আছে, আর বাবাজী চান সেই রকম মেক্‌-আপ্‌-করা মেয়ে, যে কথায় কথায় গাছের

এডালে ওডালে বসবে আর হরদম গান গাইতে থাকবে, "ওরে আমার মান্‌কে রে কোথায় ছিলি বল্‌!"

এর পরে আর আমার বলবার কিছু নেই, শুধু ছোঁড়াটার কান মলবার জন্যে হাতটা নিস্‌পিস্‌ ক'রে ওঠে, শেষে জিভ্‌ কেটে নিজের কান ম'লে শুয়ে পড়ি, কারণ তাহ'লে আর ভূতিকে শ্বশুর-ঘর করতে হবে না, সঙ্গে সঙ্গে ধূলো-পায়ে ফিরিয়ে দেবে—সে আবার আর এক ঝঞ্ঝাট!



মহিলাদের মোচ্ছব

চতুর্দিক থেকে শুনছি মেয়েরা নাকি আমাকে যাচ্ছেতাই ক'রে গাল পাড়ছেন। আমার অপরাধ—আমি নাকি দু'চক্ষে মেয়েদের দেখতে পারি না—আমার স্বভাবটাই উন্‌কুচুটে, আমি ইচ্ছে ক'রে ঝঞ্ঝাট বাঁধাই, মেয়েরা না হ'লে আমার চলত কেমন ক'রে তাঁরা দেখতেন, ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা।

বাড়িতে তো এ-রকম হরদম শুনি, সেদিন এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েও এই রকম নানা কথা শুনে এলুম। বন্ধুর স্ত্রী, দরজার আড়াল থেকে পর্দা বাঁচিয়ে আমাকে সমালোচনা করতে করতে ফর্দাফাঁই ক'রে ছেড়ে দিলেন। আমাকে—একচোখো, স্বার্থপর পুরুষ মানুষ নিজের নিয়েই আছেন, গাঁজা খেয়ে ঐরকম ঝঞ্ঝাট কেউ যদি বানিয়ে বানিয়ে লেখে আর মেয়েদের ঘাড়ে দোষ চাপায়, তাহ'লে তার ঝঞ্ঝাট কোন দিন কাটবে না ইত্যাদি ইত্যাদি ক'রে আড়াই ঘণ্টা কথামৃত পান করালেন। প্রাণ যায় আর কি !

অবশেষে বন্ধুটি লজ্জিত হ'য়ে নিজের স্ত্রীকে মৃদু ভৎর্সনা ক'রে ব'লে উঠলেন, যাক্‌গে, ও তো আর তোমায় বলে নি, ছেড়ে দাও—অ্যাদ্দিন পরে এসেছে।

স্বামীর বাক্যে স্ত্রী আরও উত্তেজিত হ'য়ে ব'লে যেতে লাগলেন, আমায় না বললেই বা—আমাদের জাতকে তো বলেন, আজকে যখন হাতের কাছে পেয়েছি তখন এমনি ছেড়ে দোব ?

এ বলে কি রে বাবা!

আমার তো প্রাণ ধুক্‌পুক্‌ ক'রে উঠল। অবশ্য বন্ধু কাছেই আছেন এই যা ভরসা!

মশাই, শেষে আমাকে অবলম্বন ক'রে তাঁদের স্বামী স্ত্রীতে হাতাহাতি হবার উপক্রম। এ কি ঝঞ্চাট বলুন দেখি?—শুনলুম সেদিন সারাদিনের মধ্যে তিনি নাকি কাউকে দু-চারটে ভাল মন্দ কথা শোনাতে পারেন নি, অতএব আমাকে নিয়ে পড়লেন। মেয়েরা ঝগড়া না ক'রে যদি নির্বিবাদে সংসার ক'রে যান তাহ'লে তাঁদের প্রেস্টিজ থাকে না কিনা! এতেও মেয়েরা বলবেন তাঁরা ঝঞ্চাট তৈরী করেন না। কি করব বলুন? বাড়িতেও মেয়েদের সঙ্গে তর্ক ক'রে পারি নি—বাইরে তো ছেড়েই দিন!

কিন্তু আপনারা একবার স্ব স্ব বুকে হাত দিয়ে বলুন, ওঁদের নিয়ে বিয়ের পর এক বছর বাদ দিয়ে কে নির্ঝঞ্চাটে কাটালেন? আমি তো মশাই পারলুম না! আপনারা যদি পেরে থাকেন তাহ'লে জানব যে পূর্বজন্মে অনেক পুণ্য করেছিলেন, তাই এ জন্মে ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ ক'রে গ্যাঁট্‌ হ'য়ে ব'সে আছেন।

মশাই, এঁদের সাজ-পোষাক, রান্নাবান্না, কোথাও নিয়ে যাওয়া, প্রত্যেক জিনিসে হাঙ্গামা আর ঝঞ্চাট!—

বাজারে টো-টো ক'রে ঘুরে রাজ্যের জিনিস এনে দেব, সে পছন্দ নয়, ম্যাগো, এ আবার ফিতে—যেন দড়ি, ও কি পাউডার—ও গুঁড়ো ময়দা, এ কি আবার ফ্রক্‌—এক ধোপেই ঠ্যাংঠ্যাংয়ে হ'য়ে যাবে, এ কি শাড়ী—ম্যাগো মা, কী পাড়েরই ছিরি, আমাদের শশী-ঝি ঐ প'রে বাজারে যায়!

আচ্ছা বলুন তো কি ঝঞ্ঝাট ?

আমি এখন কোথা থেকে এমন ফ্রক্ পাই যা ছেলেপুলেদেরও চলবে আবার দরকার হ'লে শায়ার বদলে তাদের মাও খপ্ ক'রে সেটি প'রে নিয়ে রান্নাঘর থেকে চচ্চড়ি রেঁধে নিয়ে আসবেন ? আর বলুন—কোথায় এমন সব শাড়ী বেরিয়েছে যা ঝিয়েরা পরে না ?

তাহ'লে তো কাজকর্ম ছেড়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঝিয়েরা কি কি পাড় প'রে ঘুরছে তাই দেখে বেড়াতে হয়। আচ্ছা বলুন দেখি, এর কোন মানে আছে ?

তারপর দর,—শুনি প্রত্যেকটায় আমি ঠকেছি। আমি যত বলি, ওরে বাপু, আজকাল সব দর বাঁধা, সবাই এক দামে কিনছে —তা কে বিশ্বাস করছে সে কথা ?

তুমি দর করতে পার না, যে যা বলে তাতেই সায় দাও।

তর্ক করতে গেলুম, গিন্নী তক্ষুনি দর-করা কাকে বলে দেখিয়ে দিলেন। মাছওয়ালা আড়াই টাকা সেরে মাছের দর হাঁকলে, তিনি ব'লে উঠলেন, আট আনায় দিবি ?

মানে, মনে করুন, ওঁর দর দেওয়া দেখে আমার কান দুটো লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠল—উনি নির্বিকার। আর আশ্চর্য— মাছওয়ালাটাও কি তেমনি শেষ পর্যন্ত বারো আনায় রাজী হ'য়ে গিয়ে একসেরা বাট্খারা পাল্লায় চাপিয়ে বসলো—গিন্নী পাষাণ ভাঙিয়ে আগে পাল্লা ঠিক করালেন, তারপর তার থেকে বড় বড়-গুলো বেছে পোয়াটাকের বেশি কিনলেন না।

ব্যাস্!—এর পর থেকেই আমার কপাল ভাঙল! যা আনি

তাতেই, ঝঞ্ঝাট!—ঠকেছি। এই নিয়ে কাঁহাতক মেয়েদের সঙ্গে ঝগড়া করি বলুন তো?

ঘর-সংসার ছাড়া পৃথিবী লম্বা কি গোল সে খবর পর্যন্ত রাখি না, কিন্তু তাও নির্ঝঞ্ঝাটে ঘরের লোকগুলি কি আমায় থাকতে দেবে?

এই দেখুন না কেন, সেদিন বাড়ির সবার সখ হ'ল বায়োস্কোপ যাবেন, আমাকে নিয়ে যেতে হবে। আমি বললুম, বাড়ির এতবড় ফৌজ নিয়ে আমি কোথাও যেতে পারব না। বলতেই—বাড়ির মেয়েদের, বৌয়েদের, ভাইঝিদের আমার ওপর কি রাগ!

তবু বললুম, রাগারাগির অত দরকার কি, আমি পয়সা দিচ্ছি, তোমরা পটকা ফটকা কাউকে নিয়ে যাও।

অমনি সমস্বরে প্রতিবাদ উঠল, ঐটুকু ছেলে কখনও এতগুলোকে সামলাতে পারবে?—মনে মনে বললুম, তোমাদের পৃথিবীতে কোন লোক সামলাতে পারবে না বাবা। শেষ পর্যন্ত সেই যেতে হ'ল আমাকেই।

কিন্তু মেয়েদের কোথাও নিয়ে যাওয়া কি সোজা ব্যাপার? পারতপক্ষে আমি ঐ ব্যাপারে থাকি না। মশাই, একবার এঁদের গুটি পাঁচেককে মধুপুরে নিয়ে যেতে কি নাজেহাল যে হয়েছি, তা আর কহতব্য নয়! মাসখানেক তো থাকব, কিন্তু তার বন্দোবস্তর চোটে অস্থির!

বিছানা, বালিশ—নয় দরকারী, সঙ্গে গেল; কিন্তু তার সঙ্গে আটটা ট্রাঙ্কভর্তি রাজ্যের কাপড়, পাঁচখানা কড়া, ছ'টা বালতি, তিনটে হ্যারিকেন, একুশটা গাম্‌লা, এক ডজন মসলার টিন, তু টিন ঘি, ছ'গোছ পান, এক বাণ্ডিল সুপুরি, তিন সের খয়ের, চারটে

হাঁড়ি, ভুটো ছাতা ইত্যাদি গুষ্টির মাথা নিয়ে জিনিসের সংখ্যা দাঁড়ালো পঁয়ত্রিশটি!—এই নিয়ে পূজোর সময় কেউ অত ভীড়ে ট্রেনে উঠতে পারে?

সেগুলোকে সামলাবো, না, মেয়েদের সামলাবো কিছুই ঠাওর ক'রে উঠতে পারি না। পঁয়তাল্লিশ বার ক'রে পুঁটলি গুণে শেষ পর্যন্ত মধুপুরে গোটা পনেরো আর পৌছল না। কিছু প'ড়ে রইলো ঘোড়ার গাড়ীতে, কিছু কুলীর মাথায়, কিছু ট্রেনে—সে কী ছোটা-ছুটি!

কোথাও জায়গা পাই না—মাকুর মত একবার ইদিক একবার উদিক, পাঁচটা জীবন্ত গুড়ের নাগরী নিয়ে ঘুরে একটা কামরা কোনরকমে আক্রমণ করা গেল। এদিকে ঘেমে নেয়ে পাউডার ফাউডার গ'লে গিয়ে, পাঁচজনের সামনে যেটাকে এত ঢাকবার চেষ্টা, শেষ পর্যন্ত সেই আসল স্বরূপ মূর্তিটি বার ক'রে থাপুস থাপুস করতে করতে সব কামরায় উঠলেন!

তারপর জিনিস গোণার পালা। দেখা গেল—আমাদের আনবার চেষ্টা করলে কি হবে জিনিসের আসবার ইচ্ছে নেই।' সব তাল পড়লো আমার ওপর, 'তোমার কোন হুঁস্ নেই।'

আমি মনে করুন, তখন ভিড়ের চাপে বেহুঁস। সহযাত্রী আর সহযাত্রিনীরা সবাই আশ্বাস দিলেন যে, মধুপুরের পর আর এত ভীড় থাকবে না, সবাই তাঁরা নেমে যাবেন—আমরা যেন কাশ্মীরে হাওয়া খেতে বেরিয়েছি।

সেই থেকে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম মেয়েদের নিয়ে যদি আর কোথাও যাই! আজ আবার সেই দুর্ভোগ!

ছটায় বায়স্কোপ আরম্ভ—তিন দিন আগে থেকে টিকিট কেনা হ'ল। সকাল থেকে মেয়েদের ও-বেলার কাজকর্ম তাড়াহুড়ো ক'রে সেরে নেবার বাসনা হ'ল। পাঁচটা পঁয়তাল্লিশে তাঁরা গা-ধুতে গেলেন।—এর পর সাজার পালা! এদিকে তিনখানা রিক্সা আনানো হ'য়ে গেছে, তারা এক ঘণ্টা ধ'রে যে রকম, 'এ বাবু, এ বাবু' ক'রে মিনতির স্বরে আমায় ডাকছে তাতেই বুঝলুম শেষ পর্যন্ত ভাড়া নিয়ে আমায় হাবুডুবু খাওয়াবে। ছেলেগুলো নীচে গিয়ে চিৎকার শুরু করেছে—কিন্তু এঁরা বধির।

মেঝ বৌমার হয় তো সেজ বৌমার হয় না, সেজ বৌমার হয় তো গিন্নীর হয় না। রিক্সার কথা ব'লে তাড়া দিলে বলেন, এয়েছে এয়েছে একটু দাঁড়াক না, সোয়ারীর হবে তবে তো?

আমি বললুম, তুমি তো বললে ওরা দাঁড়াক, তবে চড়াক্ চড়াক্ ক'রে যে ভাড়া উঠছে সে খেয়াল আছে?

গিন্নী আপন মনে নিজের খুশিমত কাজ ক'রে যেতে যেতে ব'লে উঠলেন, খুব আছে, তুমি আর ব'কে মাথা খারাপ ক'রো না—রিক্সাওয়ালার কাছার সঙ্গে তো আর মিটার বাঁধা নেই যে, দু'মিনিট দাঁড়ালে দু'আনা উঠে যাবে, তুমি থাম।

বচনের চোটে থামতে বাধ্য হলুম। আরো দশ মিনিট কাটলো। অবশেষে গিন্নীরও বোধ হয় চক্ষুলজ্জা হ'ল, ব'লে উঠলেন, ওরা ততক্ষণ নীচে গিয়ে রিক্সায় বসুক না, আমি এই মেয়েগুলোকে পরিয়েই যাচ্ছি। হতাশ হয়ে খাটের উপর ব'সে জুলজুল ক'রে চেয়ে এই অভিনব ব্যাপারের দর্শক হওয়া ছাড়া আমার গত্যন্তর রইল না।

তখন ছ'টা পঁয়ত্রিশ। পুঁচ্‌কে মেয়েগুলোর আবার বায়নাক্কা কত—এটা পরবো না, ওটা দাও—এ আবার কি খোঁপা হয়েছে? আজকাল কেউ আদ্দে-খোঁপা ছাড়া বাঁধে? অর্থ্যাৎ অর্ধেক এলিয়ে, অর্ধেক গুটিয়ে ঘাড়ে কেৎরে প'ড়ে থাকবে এই আর কি—তাই নিয়েও আধ ঘণ্টা চুলোচুলি, চড় কীল হয়ে গেল।

আমি তো বিছানায় ফ্ল্যাট—এ কি ঝঞ্ঝাট রে বাবা! এরা দেখছি ছ'টার শো কাবার ক'রে দেবে স্রেফ চেহারা ঠিক করতে। মনে মনে বললুম, বাবা, বিধাতা তোমাদের দয়া ক'রে বুঝে বুঝে আমার ঘরে পাঠিয়েছে, ও কি আর বুরুশ ঘ'সে আর চুলের কেয়ারী ক'রে মেরামৎ করা যায়? এখন দয়া ক'রে সব চল!

প্রায় ইণ্টারভেলের সময় বরাবর শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে একুশটি সওয়ারী তিনখানি রিক্সায়, তিন থাক ক'রে চেপে বসলেন। রিক্সাওয়ালারা তো থ! একটু সম্বিৎ ফিরে পেয়েই তারা ব'লে উঠলো, হামলোক নেহি সকেগা!

মানে, আমারও লজ্জা করতে লাগলো, ভাবুন! কিন্তু সে বেচারীদের কথা শোনে কে? সোয়ারীদের কাছ থেকেও তড়িক্ ঘড়িক্ জবাব এল, খুব সাকেগা,—নে নে এখন তোল্। ব'লে এমনি করকে রোজ দু বেলা আমরা গঙ্গার ঘাটমে যাতা হ্যায়।

প্রাণের দায়ে সে বেচারীরা তুললো। দু'খানা কোনক্রমে বায়স্কোপ অবধি পৌঁছল। কিন্তু একখানা মচাৎ ক'রে গেল মাঝ পথে ভেঙে আর সঙ্গে সঙ্গে মেঝ বৌমা, থেব্‌ড়ি, হাব্‌লি, ভুঁটে সব রাস্তার মাঝখানে কুমড়ো গড়াগড়ি!

সুখের বিষয় রাস্তায় ছড়াবার জন্যে ফুটপাতের ধারে গাদা-করা বালি ছিল, তার ওপর কয়েকজন ছিটকে পড়াতে বেশি লাগলো না কারুর, কিন্তু রাস্তায় সে কী কেলেঙ্কারী আর কি ঝঞ্ঝাট!

জীবনের ঝঞ্ঝাট

পৃথিবীতে নিশ্চিন্ত হ'য়ে যাঁরা চলবার চেষ্টা ক'রে থাকেন—আমি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু বিধাতা আমাকে সে সুখভোগ করতে দেবেন না ব'লে প্রতিজ্ঞা ক'রে ব'সে আছেন। আমি আমার জীবনটাকে পর্যালোচনা ক'রে বেশ হাড়ে হাড়ে বুঝছি যে গীতার মর্মবাণী আমার ওপর দিয়ে পুরোপুরি পরীক্ষার জন্যে ভাগ্যবিধাতা উঠে প'ড়ে লেগেছেন। গীতার সারমর্ম হচ্ছে যে, 'বাপু হে, সংসারে এসেছ অবিরত কর্ম ক'রে যাও—ফলের প্রতি আগ্রহ দেখিও না, যদি তা দেখাও তা হ'লে মরবে, তোমার দুঃখে শেয়াল কুকুর কাঁদবে।'

কথাটা বড় লাগসই—সেটা খুব হৃদয়ঙ্গম ক'রেই সংসারে চলি, কারণ আমি জানি আমার ভাগ্যে মাকাল ফল কিংবা দড়কোঁচা মার্কা ফল ছাড়া আর কিছু জুটবে না; কিন্তু না চাইলেও দেখতে পাচ্ছি ফল ক্রমাগত ফলছে, অবশ্য বাংলায় নয়, ইংরেজিতে।

সম্প্রতি ট্রামে উঠতে গিয়ে সহযাত্রীদের তাড়নায় একদিন 'ফল' হয়েছে, রাস্তায় আঁবের খোসায় একদিন 'ফল্' ফল্‌তে ফল্‌তে সামলে যাওয়া গেছে এবং আর একদিন সিঁড়িতে কোনরূপ নেশাভাঙ না-করা সত্ত্বেও যা 'ফল্' হ'ল তাতে এ যাত্রায় যে কি ক'রে টিঁকে যাওয়া গেল সেইটেই এখনও বুঝতে পাচ্ছি না। ক্রমশঃ আমার অবস্থা যুদ্ধের শেষ বরাবর "ইম্ফলে" জাপানীদের যে

অবস্থা হয়েছিল প্রায় তাই হ'য়ে আসছে—এটা বেশ বুঝতে পাচ্ছি। 'মাউচি সড়ক' দিয়ে যে-ভাবে মিত্রপক্ষের ঠেলায় প'ড়ে শত্রুদের ছুটতে হয়েছিল, ঠিক সেইভাবে আমারও ছুটবার দিন এসে গেছে। এখন চতুর্দিকে কণ্ট্রোল রয়েছে ব'লে প্রাণ 'যাউচি' 'যাউচি' করলেও বোধ হয় ঠিক সুবিধে ক'রে বেরুতে পারছে না।

জীবন যাওয়া ঘণ্টা কয়েকের ব্যাপার কিন্তু জীবন রাখা যে এই রকম ঝঞ্ঝাটের কাজ তা চারধারের ঠেলায় যা মালুম করাচ্ছে তা আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝছি—আপনারা কেউ হয়তো বুঝছেন না, কিন্তু আমায় প্রতিদিন পরম পিতা পরমেশ্বর আমার ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষের তর্পণ করাতে করাতে বোঝাচ্ছেন।

সকাল বেলায় একটু চা খাওয়ার অভ্যাস আছে মশাই! কিন্তু এক চামচ দুধ সকাল ৮টার আগে মিলবে না—যদিও বা দাম দিয়ে সের দেড়েক ক'রে টাকায় কিনলেন তাও সেই আদি ও অকৃত্রিম জলীয় বস্তু ছাড়া আর কিছু তাতে নেই। দুধের নামে যে জিনিস আমরা পান করি তা আর যাই হোক তা যে মা ভগবতীর বাঁট থেকে নিঃসৃত হয় না—এটা বোধ হয় আপনারাও স্বীকার করবেন।

অথচ মনে করুন—জেনে শুনেও সে জিনিস আমাদের কিনতে হবে, যেহেতু ডাক্তারে বলেছে, 'ছেলেদের দুধ খাওয়াও, তা না হ'লে আর কি পুষ্টিকর খাবে? যদি না খাওয়াই তা হ'লে জগতের সমস্ত শুভানুধ্যায়ীরা ব'লবেন, 'ওঃ, লোকটা কী চামার দেখেছ, ছেলেপুলেদের এক বাটি দুধও খাওয়ায় না!'

অতএব এ সমস্ত স্মরণ ক'রে রোজই এ ঝঞ্ঝাট পোয়াচ্ছি।

কিন্তু তাই কি নিশ্চিন্তে পোয়ান যায়—গিন্নী রোজই চেঁচাচ্ছেন, "একটু সকাল সকাল উঠে ভাল গরুর দুধ দুইয়ে আনতে পার না ?" যদি বলি, "হ্যাঃ, আমার আর কোন কাজ কর্ম নেই, কে কোথায় গরুর দুধ দুইছে আমি সেখানে ভাঁড় নিয়ে গিয়ে ব'সে থাকি," তিনি আমার চেয়ে আরও কয়েক ডিগ্রী গলা চড়িয়ে ব'লে ওঠেন, "সব্বার বাড়ির লোকই তাই করছে।"

আরও প্রতিবাদ করি, ঠিক সেই সময় গিন্নী চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন—পাশের বাড়ির চক্রবর্তী মশাই নাদুস্ নুদুস্ ভুঁড়িটি দোলাতে দোলাতে একটি বালতি হাতে নিয়ে কোথা থেকে দুধ দুইয়ে আনছেন! এরপর আর উত্তর দেওয়া চলে কি ?

দু'আনা দিয়ে খবরের কাগজ কিনি কিন্তু নির্ঝঞ্ঝাটে পড়ি কখন বলতে পারেন—অথচ দেশ আছে কি গেল তার তো একটা খবর নেওয়া দরকার ? কিন্তু নেব কি ক'রে ? বাজারে মাছ পাওয়া যাচ্ছে না অতএব 'মাছ আনো,' তা না হ'লে ছেলেপুলেরা মুখে ভাত দেয় কি ক'রে ? ছেলেমেয়েদের পড়া ব'লে দাও, তিন দিন মাস্টার আসেনি। কাপড় নেই, পারমিট যোগাড় কর—পারমিটে শাড়ি আনবে, না, ধুতি আনবে, না, পাঁচ গজ মার্কিনের বিছানার চাদর এনে গুষ্টিবর্গ ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়বে—এই নিয়ে তিন দিন ধ'রে জটলা কর। সরষের তেল পাওয়া যায় না, তোমার ঘরে যেটুকু তেল আছে, তাই হাতে নিয়ে বাইরে যাকে যাকে মাখাতে হবে তার আয়োজন কর। পূজো এসেছে তুমি সবার মুখে হাসি ফোটাবার বন্দোবস্ত ক'রে দাও। ছাতার হাতা নেই, শিক নেই, সেগুলো আবার কোথায় গেল তাই খুঁজে পেতে বার ক'রে

যথাস্থানে লাগাও, তা না হ'লে সবাই কি ভিজে ভিজে চলবে ?

বাড়ির সব ঠিক ব্যবস্থা ক'রে যথাসময়ে আপিসে গিয়ে হাজির হও—ট্রামে-বাসে, মাঝ-রাস্তা থেকে উঠতে না পার ডিপোয় গিয়ে ওঠ—যথাসময়ে হাজিরা দিয়ে যে-কোন সময় রাত্তির আটটা ন'টা



নাগাদ আপিস থেকে বেরোও ...আপিসে খাও না-খাও ক্ষতি নেই, ওপরওয়ালাদের সর্বসময় খুসী রেখো—সাহেব কখন হাসছেন, কখন কাসছেন, কখন চুপ্ সোচ্ছেন —কাজের চেয়ে তার খবর রাখো আগে।

যদি এর ওপর আপ্ টুডেট্ হ'তে চাও তাহ'লে ফুটবলের মাঠে ছপুর থেকে ব'সে থাক, সিনেমার অভিনেত্রীরা কে নাচছেন, কে কাঁসছেন তা নোটবুকে টুকে রেখে দাও—এই সব খবর সংগ্রহ ক'রে বেলা পাঁচটায় কি সাতটায় তিনটে থলি হাতে নিয়ে গলায় একটা তেলের কানেস্তারা ঝুলিয়ে বহাল তবিয়তে আপিস থেকে বাড়ির জন্যে রেশন আনো ! বাড়িতে ঢুকেই কি সেদিনকার ঝঞ্ঝাট কাটলো না কি ? রামঃ !



'খ্যাঁদা' ক'দিন ধ'রে বাদলার হাওয়া লেগে খ্যাঁৎ খ্যাঁৎ করছে, তার জন্যে হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের কাছে ছোটো—সারাদিন গিন্নী রান্নাঘরে তেতে-পুড়ে গরমে কাটিয়েছেন, আর আমি তো সারাদিন ফ্যানের হাওয়া খেয়ে আড্ডা দিয়ে এলুম কি না, তাই রাত্তিরটা



আর তিনি কোন ঝক্কি পোয়াতে পারেন না—অতএব রাত দু'টোর সময় পান্তুটা পরিত্রাহি চেঁচালে তাকে একটু কোলে ক'রে ভোলাও —'ন্যাংচা কাঁথাটাকে ভিজিয়েছে ওটা বাইরের বারান্দায় ফেলে দিয়ে আর একটা নতুন কাঁথায় ওকে শুইয়ে দাও' ইত্যাদির ঠেলায় চক্ষু অন্ধকার!

আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না যে, কোন্ দুষ্কর্মের ফলে আমাকেই বুঝে বুঝে আক্কেলটা দেওয়া হচ্ছে। ভেবেছিলুম যুদ্ধের পরে ঝঞ্ঝাট কাটবে, কিন্তু ক্রমশঃ দেখছি যে 'এ্যাটম্ বম্' যেমন না খেলেও পরে তার আঁচে ঝল্‌সে ম'রে যেতে হয় আমার অবস্থাও হয়েছে প্রায় তদ্রূপ বা তার চাইতে খারাপ—ঝল্‌সে মরছি না সত্যি —শুধু এ বাজারে জ্বলছি আর বাল্‌সাচ্ছি।

বেঁচে থাকার খেসারৎ

দেখুন, বোধ হয় ধরাতল থেকে খুব শিগ্‌গিরই আমায় পাত্‌তাড়ি গুটোতে হ'ল। মানে, প্রত্যেকে আদাজল খেয়ে যদি আমার পিছনে লাগেন তাহ'লে তো আর বাঁচা চলে না!

সারা জন্মটা শুধু ঝঞ্ঝাট পোয়াতে পোয়াতে যদি আমায় যেতে হয় তাহ'লে তো আর এ রকম বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না!

সংসারে এসে শান্তি পাওয়া যায় না—এ তো বালক-কাল থেকে শুনছি, বুড়ো বয়সে হাড়ে হাড়ে বুঝছি। কিন্তু কোথায় গেলে শান্তিটা পাব ঠিক ক'রে বলতে পারেন? ম'লেও কি ঝঞ্ঝাটের হাত থেকে রেহাই পাব ভাবছেন? রামঃ! সে রকম বরাত আমার নয়।

এ তবু আপনাদের বিধাতার কাছ থেকে দূরে আছি—একটু নাগালের বাইরে; কিন্তু হাতের কাছে পেলে তিনি কি আমায় চট্ ক'রে ছেড়ে দেবেন ভাবছেন?

সে আশা দুরাশা!

হয়তো সেখানে গিয়ে দেখবো পঙ্গপাল আমার দেশের লোক ব'সে আছেন।

ব্যাস, তাহ'লেই তো সব ফর্সা হ'য়ে গেল!

পৃথিবীতে যাঁরা আমার পেছনে লাগবার সময় ক'রে উঠতে পারেন নি, তখন হয়তো তাঁরা আমায় সেখানে নিয়ে পড়বেন। তখন অবস্থাটা কি হবে ভাবুন তো ?

এখানে আর কিছু না হোক রিপোর্ট করবার তবু একটু জায়গা আছে—তাতে ফল পাওয়া যাক্ না যাক্, তবু অন্ততঃ সব বিষয়ে মনে একটু সান্ত্বনা পাওয়া যায়, কিন্তু সেখানে হয়তো ওপরওয়ালাদের এতটুকু চক্ষুলজ্জাও নেই! ঝঞ্ঝাট আছে কিন্তু ঝঞ্ঝাট কাটবার রাস্তা নেই—মানে চোর আছে থানা নেই—কাপড় আছে কিন্তু তার ওপর কারোর কোন কন্‌ট্রোল নেই—ভাত আছে কিন্তু তা পাতে দেবার ব্যবস্থা নেই, সে আরও একটা মহা ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার তো!

তার ওপর মনে করুন পৃথিবীর অধিকাংশ বজ্জাত লোককে মেরে ধ'রে যুদ্ধ ক'রে সব ওপরের দিকে চালান ক'রে দেওয়া হয়েছে, এখন সেখানে গিয়ে আমাদের মত নিরীহ ব্যক্তিরা পৌঁছলে কি ব্যাপার হবে তা অনুমান করতে পারেন কি ?

অথচ এদিকেও বেঁচে থাকা এক ঝঞ্ঝাট। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আজকাল এত রকমের ঝঞ্ঝাট বাড়ছে যে আমাদের পূর্বপুরুষেরা বোধ হয় এ সব আগে থেকে অনুমান করতে পারলে আমাদের সংসারে টেনে নিয়ে এসে আর এ কেলেঙ্কারী করতেন না।

মশাই, আমি কি সাধে বলি যে এসব ছেড়ে পালিয়ে যাই ? আজকাল মেয়েদের বিয়ের কথাটা ভাবুন! যে ছেলের দর মনে করুন আগে পাঁচসিকে দেড়টাকা ছিল, তার দাম এখন সাড়ে তিন

হাজার চার হাজার। যুদ্ধের সময় এ, আর, পি, না, সাপ্লাইয়ে কাজ জুটলো, আর যায় কোথা—তাদের বাপ মা আর কথা কয় না।

আমার এক ভাগ্নী থেবৃড়িটার সেই রকম দেখেই মশাই কিছু দিন আগে একটা বিয়ে দিলুম, আর অশ্চর্য! তার এক মাসের মধ্যে যুদ্ধ মিটে গেল! ছোক্‌রার চাকরি গেল, তারা সেই দিনই রিক্‌শো ক'রে মেয়েকে বাপের বাড়ি চালান ক'রে দিলে।

তাদের বাড়ির সবাই বললে, 'বউ অপয়া, তা না হ'লে এত বড় একটা যুদ্ধ, মেটে ?'

বুঝুন !

এখন বৌটিকে পয়া করাতে গেলে আমাকে গয়ায় গিয়ে নিজের পিণ্ডির ব্যবস্থা করতে হয়, নয়, জামায়ের একটি চাকরির যোগাড় ক'রে দিতে হয়। রেডিও আপিসের বাবুদের ধরেছি তাঁরা যদি একটা কাওয়াল বা কেত্তনের দলে তাকে ভর্তি ক'রে নেন তাহ'লে হয়তো খানিকটা ঝঞ্ঝাট কাটে।

ঠিক অবশ্য তাতেও কাটে না। এই দেখুন না কেন, বিয়ের ঝঞ্ঝাট কাটতে না কাটতে মেজবৌমার ছেলে হ'ল। সে আর এক বিপদ্ !

রাত তিনটে থেকে তিনি কাতরাতে শুরু করলেন, আর তাঁর কাত্‌রানি দেখে আমার মেজভায়ার হাত পা ঠাণ্ডা হ'তে শুরু হ'ল, অতএব রাত তিনটেয় ছোটো তুমি ডাক্তার-বাড়ি। ডাক্তারবাবু সারাদিন খাটেন, রাত্তিরে বেচারী ঘুমোন। সে সময় কারুর ছেলেপুলে হওয়াটা তিনি পছন্দ করেন না। তাই চাকরকে দিয়ে

ব'লে পাঠালেন যে কাল সকালে উঠে চা-টা খেয়ে তিনি যা ব্যবস্থা করবার করবেন, এখন উঠতে পারবেন না—ডবল্ ফি দিলেও না; ছেলেপুলে হওয়ার সময় ও সবারই একটু মোচড়ানো খেতে হয়।

এর কি প্রতিকার করি বলুন ?

কিন্তু সকালে তিনি যখন এলেন তখন চারজন ডাক্তার ডাকতে হ'ল। প্রায় সাত আট শো টাকা খামকা খরচ হ'য়ে গেল—তবে দয়া ক'রে একটি ছেলে বেরুলেন—বেচারী বোধ হয় খবরের কাগজ টাগজ প'ড়ে কিছুতেই বেরুতে রাজী হচ্ছিল না—কিন্তু তার জন্যে আমার ঝঞ্ঝাটটা বুঝুন !

তারপর ডাক্তারবাবুরা যা সব ওষুধের ফর্দ দিলেন তার একটাও পাওয়া গেল না—তাঁদের বললাম, তাঁরা তো খিঁচিয়ে উঠলেন। ওষুধ না-পাওয়া গেলে তাঁরা কি তৈরী করবেন ?



একটু চেষ্টা করলেই পাওয়া যায়। সকলেই পাচ্ছে। এমন কি ডাক্তারবাবুদের সন্ধানেও কত লোক আছে যারা বাজারে ঘাঁৎ ঘোঁৎ সব জানেন, কিন্তু এ সব লোককে পেতে হ'লে কিছু ছাড়তে হবে।

অগত্যা ছাড়লুম। তাঁরা যে টাকায় ওষুধ এনে দিলেন তাতে তো আমার ধাত্ ছেড়ে যাবার উপক্রম হ'ল, কিন্তু উপায় তো নেই! আবার ওষুধের মধ্যেও কত ফ্যাঁসাদ; তাও আবার সবগুলি কাজে লাগল না। শেষে পরীক্ষা ক'রে বেরুলো যে ইন্‌জেক্‌শনের টিউবে নাকি আসল ওষুধই নেই! কি সর্বনাশ!

এ আবার কি ঝঞ্ঝাট বুঝুন! ওষুধ কিনবো, চোরাবাজারে দাম দেব চারগুণ, কিন্তু তাতে আসল মাল থাকবে না। এ কী কাণ্ড বলুন তো? যাক্, যা আক্কেল সেলামী যাবার তা গেল, ও পর্ব চুকতেই এল আর এক পর্ব!

প্রসূতির এনিমিয়া। এখন তাকে খাওয়াই কি? ভায়ার পকেট গড়ের মাঠ, ওদিকে তার গিন্নীর এই অবস্থা! শুনেছি কচু খেলে গায়ে রক্ত হয়, তাই খাইয়ে দেখি। কারণ বর্তমানে ঐ জিনিসটা ছাড়া আর তো বাজারে কোন খাঁটি জিনিস পাবার উপায় নেই—আমি এখন কি করি?

এদিকে একান্নবর্তী পরিবারে থাকি, একশো একষট্টি জনের দায়িত্ব এই এক জনের ঘাড়ে, অতএব আমিই ঝঞ্ঝাট পোয়াই।

যদি বলেন, আলাদা হও না কেন, অত ঝামেলার দরকার কি? বেশ বললেন! কোথায় আলাদা হব বলতে পারেন? ট্রাম-বাসের কাছাকাছি গোটা বত্রিশ টাকায় খান চারেক ঘরওয়ালা একটা ছোট খাট বাড়ি বা ফ্ল্যাট জোগাড় ক'রে দিতে পারেন? তাহ'লে দেখি আপনাদের পরামর্শ শুনে ঝঞ্ঝাটের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাই কি না!

প্রতিবেশীর প্রীতি

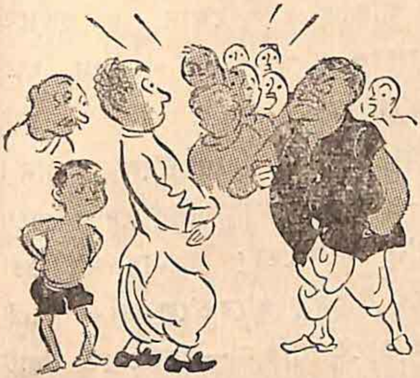
এবার এ দেশ বোধ হয় আমায় ছাড়তে হ'ল!

বেশ বুঝতে পাচ্ছি সকলে মিলে আমায় তাড়াবেন। কি ঝঞ্ঝাট যে যাচ্ছে তা কি বলবো বলুন!

আমার প্রতিবেশীরা কেন জানি না মশাই, আমার ওপর হাড়ে চটা—নিশ্চয় আমার দোষ আছে, তা না হ'লে তাঁরা সকলে ভাল লোক আমাকে একযোগে আক্রমণ করবেন কেন?—অথচ কেউ মুখে কিছু বলছেন না, আমার বাড়িতে ইঁট ফেলেছেন না, আমার নামে ছড়া বাঁধছেন না, অথচ যা করছেন তাতে বেঁচে থেকে বহাল তবিয়তে চলাফেরা করা অসম্ভব! প্রাতঃকালে আমি উঠি, তাঁরা ঘুমোন, ঐ সময়টা একটু যা নিশ্চিন্দি—তারপর বেলা ৮টা থেকে তাঁরা লীলা শুরু করলেন। তাঁরা প্রত্যেকে খুব পরিষ্কার এটা আমাকে বোঝাবার জন্যে নিজেদের বাড়ির যাবতীয় জঞ্জাল আমার বাড়ির সামনেটিতে দেখিয়ে দেখিয়ে ফেলে দিয়ে যাবেন। কাঁচের শিশি বোতল ভাঙা থেকে শুরু ক'রে ছোট ছেলেপুলেদের ইত্যাদি থুপ্ থাপ্ অবিরত পড়ছেই। মাঝে মাঝে মাথায়ও পড়ে। এখন এর প্রতিকার কি?

একদিন একটি ভদ্রলোককে ডেকে বিনীতভাবে বললুম যে, মশাই, দয়া ক'রে যদি বাড়ির লোকদের নোংরাটা দু'পা একটু এগিয়ে ডাস্ট্ বিনে ফেলে দিয়ে আসতে বলেন তা হ'লে তো

সবার পক্ষে সেটা ভালই হয়, কি বলেন ? এই যেই না বলা আর যায় কোথা—একেবারে যেন পেট্রোলে আগুন ধ'রে গেল।



ভদ্রলোক চীৎকার ক'রে পাড়ার তিনশো লোক জড় ক'রে ফেললেন—সে ভীষণ ব্যাপার! 'বেশ করবে, ছ'শোবার ফেলবে, বাড়ির মেয়েরা কি রাস্তায় হেঁটে গিয়ে ডাস্ট্‌বিনে নোংরা ফেলতে যাবে, কোম্পানীর রাস্তা কারুর বাবার তৈরী নয়, মিন্‌সিপ্যালিটিকে ট্যাক্স দিই, আপনার সবেতেই ইন্‌টারফিয়ার করা স্বভাব, আমার ফ্যামিলি ম্যাটার তাতে কোন ব্যাটার কি বলবার আছে?—নাও ঠ্যালা!

আমি একেবারে নির্বাক—তিনশো লোক দাঁড়িয়ে গেল! মাঝখান থেকে ভীড়ের মধ্যে তিন টাকা সাত আনা সমেত একটি ব্যাগ হাওয়া হ'য়ে গেল। বুঝুন ঝঞ্ঝাট!

ইনি আমার পশ্চিমের প্রতিবাসী।

দক্ষিণে একটি আধিভৌতিক চিকিৎসক থাকেন। পচা টিক্‌টিকি, গিরগিটি থেকে আরম্ভ ক'রে আরসোলা পর্যন্ত দিনরাত তাঁর কড়ায় পাক হচ্ছে। গন্ধে আমার বাড়িটি ভরপূর হ'য়ে আছে। একবার অসহ্য হ'তে তাঁর বাড়িতে আবেদন করতে গিয়ে যা পুরস্কার মিললো তাতে কোনমতে মার খেতে খেতে বেঁচে গেছি।

তিনি ব'লে উঠলেন যে, আমি নাক নাড়তে এসেছি কোন্ আক্কেলে, তাঁর নাক নেই ? ইয়ার্কি ! কোম্পানীর কোন্ আইনের, কোন্ ধারায় লেখা আছে যে, তুমি বাড়িতে ব'সে কোন গন্ধ ছড়াতে পারবে না ? তাঁর খুসী তিনি আরও ছুঁচো ইঁদুর পচাবেন, যার অসুবিধে হবে সে পাড়া ছেড়ে চ'লে যেতে পারে। ব'লেই দড়াম্ ক'রে আমার নাকের ওপর দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে চ'লে গেলেন। একেবারে মিলিটারী মেজাজ—রাস্তায় ঘাটে মিলিটারী দেখে দেখে লোকের মেজাজও সেই রকম হ'য়ে গেছে তো ! আমার মত তো আর ভীতু সবাই নয়—কি করবো কাঁচুমাচু ক'রে চ'লে এলুম। এই নিয়ে তো আর আইন আদালত করতে পারি না—আরও তো ঝঞ্ঝাট বাধানো ! শেষকালে হয়তো আরও অধিকার দেখাতে লোকটি মেয়েরা ছাদে চুল শুকোতে উঠলে নিজের ছাদে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকবে।

দক্ষিণ গেলেন। এবার আসুন পূবে। একটি আমারই মত অতি নিরীহ প্রতিবেশী। ভদ্রলোক বোধ হয় ব্যবসা করেন। রাত্তির দশটার পর তাঁর সখ গ্রামোফোন বাজানো। সবশুদ্ধ খান ছয়েক রেকর্ড তিনি জীবনে কিনেছেন এবং 'সেল' থেকে একটি সস্তায় যন্ত্র নিয়ে এসেছেন। অসীম ধৈর্য এই ভদ্রলোকের, আর ততোধিক রসানুভূতি ও সঙ্গীত-প্রীতি তাঁর ও তদীয় পরিবারবর্গের।

নিয়ম ক'রে প্রত্যহ তিনি সেই ছ'খানি রেকর্ড অন্তত ছত্রিশবার রাত্র ১টা পর্যন্ত বাজাবেন এবং রাত ২॥০টা নাগাদ শোবেন—ছুটির দিনে সকাল ১১টা থেকে ৬টা, আর রাত ১০টা থেকে ১॥০টা, আজ ছ'বছর যাবৎ চলছে, কোনদিন তাঁর নিষ্ঠার অভাব ঘটলো

না—আমাদের বাসনমাজা ঝি মনে করুন সেই গানের সুর মাঝে মাঝে গুনগুন ক'রে ভাঁজতে থাকে—। ওঃ! এঁর নির্দয়তা সবাইকে হার মানিয়েছে—আশপাশের দু-একটি প্রতিবেশীর মেজাজ দেখে এঁকে আর কিছু বলবার সাহস আমার হয় নি মশাই, তাই সমস্ত জানলা দরজা বন্ধ ক'রে ব'সে থাকি—শীতকালটা তবু চলে—গর্মিকালে সর্দি গর্মি হ'য়ে মারা যাই—আর কি! কি ঝঞ্ঝাট বলুন?

বাড়ির উত্তরে একটি ফ্ল্যাট—তাতে যে কি না আছে তাই ভাবি। গ্রামোফোন আছে—বাজখাঁই রেডিও আছে, কালী-কেত্তন আছে, প্রেসের ঘড় ঘড় আছে, থিয়েটারের রিহার্সেল আছে, মাতাল আছে, বেসুরো হারমোনিয়াম আছে এবং সেই সুরে আশ্চর্য রকম সুর মেলাবার জন্যে গায়ক আছে। এঁদের সম্মিলিত আক্রমণ, পাশাপাশি যখন রাত্রে শুরু হয়, তখন কার সাধ্যি বাড়ি থাকে! এর ওপর মনে করুন আমার বাড়ির একান্নবর্তী পরিবারের একশো একষট্টি শিশুর চিৎকার আছে—কাকে কি বলবো বলুন! মানুষের আনন্দে কি বাধা দোব? কিন্তু আমার বাঁচবার উপায়টা যে কি তার তো তাল খুঁজে পাচ্ছি না।



আমি মশাই, সাতে নেই, পাঁচে নেই—আমার পেছনে এভাবে লাগলে আমি একা কি ক'রে সকলের এত বায়নাক্কা সামলাই বলুন তো? রাস্তা

বা—৮



দিয়ে নিশ্চিন্তে যাব তা তো আপনি যেতে দেবেন না, কনুয়ের ধাক্কায় আমার পাঁজরার দফা সেরে দেবেন —ট্রামে উঠলে সিগারেট খেয়ে আমার জামা পুড়িয়ে, পা মাড়িয়ে সগর্বে চ'লে যাবেন, কনডাক্টারের কাজ নিজের হাতে নিয়ে আগে ঘণ্টা মেরে আমার ঠ্যাং ভাঙবার চেষ্টা করবেন, বাজারে কিম্বা ভীড়ের মধ্যে আমার পেছনে পকেটমারদের লেলিয়ে দেবেন, যদি ছুটো টিন নিয়ে রাস্তা দিয়ে চলেন তো আমায় তার কানাতের খোঁচা মেরে রক্তপাত করিয়ে তার সঙ্গে জামা কাপড়ের অর্দ্ধেক নিয়ে চ'লে যাবেন, রাস্তায় কলার খোসা ছড়িয়ে আমায় কাৎ ক'রে মজা দেখবেন, বারান্দা থেকে গেলাসের জলটা আমার ঘাড়ে ফেলবেন, বারণ করলে মারতে আসবেন —তার ওপর যদি বাড়িতে শোবার সময়ও একটু নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমুতে না দেন তাহ'লে আমি তো মারা যাই মশাই।



বিছানাপত্তর বেঁধে ছেঁদে চ'লে যাব কোথাও, বলছেন—আরে মশাই, সে জন্যে এই পরশু দিন এক বাণ্ডিল প্যারাসুটের দড়িও কিনে এনেছিলুম, তাতে যে সব-কিছু বাঁধতেও পারলুম না। ফিরিওয়ালা বললে ১৪ হাত দড়ি একেবারে মাপা কিন্তু তার ওপর পুরো দাম দিয়ে বাড়ি গিয়ে মেপে দেখে ৬॥০ হাতও হ'ল না। এখন ফেরত দিতে যাওয়ার মানেটা বোঝেন তো। তাহ'লে কি করবো ?—ঐটেই গলায় বেঁধে ঝুলে পড়বো কি ?

বেতার

অনেক জায়গায় কাজ করবার দুর্ভাগ্য আমার হয়েছে, কিন্তু বেতার অফিসের কাজের চেয়ে ঝঞ্ঝাটের কাজ আমার চোখে তো আর পড়ে না। সমাজ-সংসার, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সব-কিছু নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে বাউণ্ডুলে হ'য়ে যদি বেরিয়ে পড়তে চান তো বেতারে কাজ নিন!

উঃ, সামান্য একটা জিনিস তার ভেতরে অমৃতি জিলিপির পাক্—আর সেই পাক্ সামলে একটু এগিয়েছেন কি অমনি আরোও পঁচাত্তরটা পাক্ হাতে পায়ে জড়িয়ে যাবে। আমি মশাই, নির্ঝঞ্ঝাটে মানুষ, তাই জট্ খুলে বেরিয়ে পড়েছি, কিন্তু তাহ'লেও ছোঁয়ার দোষ যাবে কোথায়? এখনও বেশ তাত লাগে। এখানকার রেওয়াজই আলাদা!

চার মাস আগে থেকে ভাব কি প্রোগ্রাম হ'তে পারে—ভাবা হ'ল তো তিন মাস আগে থেকে প্রোগ্রাম লেখ—লিখে আর্টিস্টদের চুক্তি-পত্র পাঠাও, চুক্তি ফেরত এল কিনা দেখ, সই ঠিক আছে কিনা পর্যবেক্ষণ কর—তিনি সরকারী চাকুরে কি বে-সরকারী লোক সেটা খেয়াল রাখো; সরকারী লোক হ'লে তার আপিসের বড়কর্তার হুকুম নেওয়া আছে কিনা আপিসে খোঁজ নাও, কে কি গাইবেন, কতক্ষণ গাইবেন, কার গান গাইবেন, তাঁর আবার গানের অনুমতি নেওয়া আছে কি না দেখ, তা না হ'লেই গান-রচয়িতা তার

পরদিনই এটর্নীর চিঠি ঝাড়বেন সে বিষয়ে হুঁসিয়ার থেকো—কতবার আর্টিস্ট গান গাইবেন অঙ্ক ক'ষে দেখ, কেউ বেশি প্রোগ্রাম পাচ্ছে কি কম পাচ্ছে সে দিকে নজর রাখ, কেউ কেন কোন প্রোগ্রাম পাচ্ছে না তার তত্ত্বানুসন্ধান কর, কে কোন্ বারে আসতে পারবে বা কোন্ বারে পারবে না তার চার্ট ঠিক কর, কে গাইবার দশ মিনিট আগে সর্দি হয়েছে ব'লে আসতে পারবেন না ব'লে জানিয়েছেন, তাঁর জায়গায় গ্রামোফোন রেকর্ড বাজাও, কি বাজাবে তা ঠিক ক'রে দাও, কোন গান সকালে হবে কি সন্ধ্যেবেলা হবে তা গায়ক-প্রদত্ত গানের প্রথম লাইন দেখে অনুমান ক'রে যথাস্থানে বসিয়ে যাও, কবে তাঁর রিহার্সেল হবে, কোন্ সময় ছাড়া তাঁর পদার্পণের সুবিধে হবে না সেটা জেনে নিও—সেই মত মহলার বন্দোবস্ত কর, তার সঙ্গের বাজিয়েরা কে কে থাকবে সেটা বিবেচনা ক'রে রাখ—তিনি গাইতে এসে গোঁসা করলেন কি খুশী হ'য়ে চ'লে গেলেন সেটা দেখ—তাঁর প্রাপ্য পাওনা-গণ্ডা ঠিক মিলিয়ে পেলেন কিনা সে বিষয়ে কড়া নজর রাখো, তাঁর ভাউচারের সইয়ের বানান, চুক্তি-পত্রের বানানের সঙ্গে হুবহু মিললো কিনা পরীক্ষা কর, তাঁর সঙ্গে কারা বাজালো, কার গান গাওয়া হ'ল, তিনি বেশি গাইলেন কি কম গাইলেন যথাযথ লিপিবদ্ধ কর, তিনি কেমন গাইলেন তার রিপোর্ট লেখ, টেলিফোনে শ্রোতারা ঠিক সেই সময় তাঁর গান বন্ধ করতে বললে তাঁদের হেসে বল, আজ্ঞে, এখন কি করবো বলুন, আমার তো কোন হাত নেই! আপনার কথাই ঠিক, এ গান যাতে ভবিষ্যতে না হয় তার জন্যে আমি কাল থেকে আদা জল খেয়ে লাগবো!

সেই গায়কই গান শেষ ক'রে এসে তাঁর গান কি রকম লাগলো জিজ্ঞেস করলে একেবারে আনন্দে গদ গদ হ'য়ে ব'লে ওঠ, সিম্প্লি চার্মিং, আপনাকে রোজ একবার ক'রে প্রোগ্রাম দেওয়া যে কেন হয় না তা বুঝতে পারি না। কোন গায়ক শ্রোতাদের অনুরোধ মত গান গাইলেন কিনা সেটা স্মরণ রাখ, যদি মাইক্রোফোনের সামনে গাইতে গাইতে হাঁচি বা কাসি হয় তা বন্ধ করার উপায় বার কর—যদি কেউ মূর্ছা যায় তার মাথায় জল ঢালার ব্যবস্থা কর, সঙ্গে সঙ্গে প্রোগ্রামও চালাও !

একচক্ষু প্রোগ্রামে, একচক্ষু বাইরের দিকে রেখে একজনের পর ঠিক আর একজন বেতার অফিসে ঢুকছেন কিনা খেয়াল রাখো, যদি না ঢোকেন তাহ'লে প্রোগ্রামে কি ঢুকবে দেখ—গাড়ি ঠিক গেছে কিনা, কিংবা যাবে কিনা, কিংবা খারাপ হয়ে ব'সে আছে কিনা সেটার খোঁজ খবর নাও !

টাকাকড়ি ঠিকমত দিও—রামের প্রাপ্য শ্যামের ঘাড়ে চাপিও না, স্ট্যাম্পের পয়সা নিও, সর্বদা হেসে কথা ক'য়ো, ঠিকমত ঘড়ির কাঁটা ধ'রে কাজ করো, যা ঘোষণা করা হচ্ছে তা সাপ কি ব্যাঙ সেদিকে খেয়াল রেখো, কে কোন আজেবাজে বকছে কিনা কিংবা এই স্টুডিও দিতে ঐ স্টুডিও দিয়ে ব'সে রইল কিনা সেটার জন্যে সতর্ক থেকো—ছুটো ওয়েভে যখন প্রোগ্রাম চলেছে তখন দুটো ঠিক চলছে কিনা দেখে এস—কার বাড়িতে একটা জরুরী কাজ রয়েছে ব'লে তাঁর প্রোগ্রামের দিন তিনি আসতে পারবেন না, অতএব তাঁর সুবিধেমত সময়ে রেকর্ড তুলে নাও—তাঁর কণ্ঠস্বরের ব্যালেন্স কর। সারাদিন অগণিত জনতা দেখা ক'রে গান দিতে

আসছেন, হাসিমুখে অবিরত নিজের অপরাধ স্বীকার ক'রে যাও, তোমার কোন্ সহকারী কোন্ সময়ে কি কথা দিয়ে গিয়েছিলেন এবং তোমায় জানান নি তার জন্যে ঘাট মানো—গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে একটু বেশি খুশী ক'রে দিতে চাও তো চা খাওয়াও !

প্রত্যহ ষাট-সত্তর জন নবাগত শিল্পী আসেন তাদের গলা ও বলা পরীক্ষা কর এবং তাদের যদি পাস না-করাতে পার তাহ'লে তদীয় গুষ্টিবর্গের কাছ থেকে কানমলা খেয়ে যাও। তাছাড়া সরকারী আইন কানুনের মহামারী থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে প্রোগ্রামে কারিকুরি করতে থাক।

শ্রোতারা যা-খুশী গালমন্দ, সুখ্যাতি করছে তার জবাবে সর্বদা চোয়াল ব্যথা হয়ে গেলেও দুপাটি দাঁত বার ক'রে থাক। অর্থাৎ এক কথায় নিষ্কাম কর্মযোগীর মত অবস্থা না হ'লে তোমার কোন ভরসা নেই !

এর পর আপিসে ওপরওয়ালাদের অবিশ্রান্ত গাল খেয়েও মাথা গরম ক'রো না, শুধু বোবার মত হেসো। রামবোকা হ'য়ে যদি এ জায়গায় থাকতে পার তাহ'লে বেতারের চাকরি তোমার খায় কে? প্রাণের মায়া, বুদ্ধির বালাই, সৎসাহস যাদের বড্ড বেশি তাদের এ জায়গায় স্থান নেই জেনে রেখো !

আমি তো দেখে শুনেই আধ্ পাগল হয়ে গেছি এবং কয়েক জনকে হ'তে দেখছি। কিছুদিন পরে যদি এদের মধ্যে কয়েকটিকে বিশেষ কোন প্রদেশের স্বাস্থ্যকর জায়গায় আটক দেখতে পান তাহ'লে জানবেন এরাই প্রকৃত বুদ্ধিমান। ওখানকার ঝঞ্ঝাট কাটবার জন্যেই সকলে এখানে স্বেচ্ছায় আশ্রয় নিয়েছে।

সত্যি কথার ঝক্‌মারি

সংসারে সত্যি কথা বলার চেয়ে ঝঞ্চাট বোধ হয় আর কিছু নেই! আমি এটা আগে বুঝতুম না, এখন হাড়ে হাড়ে বুঝছি। ছেলেবেলায় বিদ্যেসাগর মহাশয়ের পরামর্শ শুনে 'কদাচ মিথ্যা কথা কহিও না' প্র্যাকটিস করতে গিয়ে যা লাঞ্ছনা গোড়া থেকে শুরু হয়েছিল তার তাৎপর্য যদি তখন থেকে বুঝেই সামলে যেতুম তাহ'লে ভবিষ্যতে বহু ঝঞ্চাটের হাত থেকে মুক্তিলাভ ঘটতো। আমি সব কিছুই আবার একটু লেটে (দেরিতে) বুঝি কিনা— ঐখানেই আমার গলদ—তাই লাঞ্ছনাও বড় কম হয় নি!

বেশ মনে আছে, স্কুলে ছুটোছুটি করতে গিয়ে পা লেগে একটা গাছের টব গেল ভেঙে—ব্যাপারটা নিতান্ত অনিচ্ছাকৃত, যাই হোক



গোলমালের মধ্যে কার ঠ্যাং লেগে তা গেল, তা কেউ ঠাওর করতে পারলে না। হেডমাস্টার মশাই ক্লাসশুদ্ধ ছেলেকে মাঠে দাঁড় করিয়ে বেত নাচাতে নাচাতে বলতে লাগলেন—কে টব ভেঙেছে শীগগির সত্যি ক'রে বল্—তা না হ'লে মেরে তোদের এইখানে ছাল ছাড়িয়ে দোব—বল্—সত্যি কথা বল্, তা না হ'লে রেহাই পাবি না ব'লে দিচ্ছি।

সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে, ভয়ে সবার আত্মারাম শুকিয়ে গেছে দেখে আমি নিজেই আগে থেকে সত্যি কথাটা ব'লে ফেললুম। আর যায় কোথা? বেতটা বে-জায়গায় পড়লে হেডমাস্টার মশাই অত খুশী হতেন না বোধ হয়, মন খুঁতখুঁত করতো—এখন আসল লোককে পেয়ে তিনি বাঘের মত লাফিয়ে উঠে, আমার ঘাড় ধ'রে সপাসপ কয়েক ঘা বসিয়ে দিলেন—অবশ্য মুখে বললেন, আমি সত্যি কথা বলায় তিনি খুশী হয়েছেন, কিন্তু আমার অসাবধান হওয়ার ফলে তিনি চটেছেন ব'লেই দু'চার ঘা কসিয়ে দিলেন। বাড়িতে চিঠি লিখে টবের দাম চেয়ে পাঠালেন—সেখানেও দাম পাঠাবার আগে দমাদম দু'চার ঘা হ'য়ে গেল।

সেইদিনই বুঝলুম—ওরে বাবা, সত্যি কথা বলার অনেক ঝঞ্ঝাট! কিন্তু আক্কেল কি একবারেই মানুষের হয়, তাহ'লে বরাবর বেয়াক্কেলের মত কাণ্ড ক'রে ঝঞ্ঝাট ডেকে আনবে কেন? অঙ্ক মাথায় কিছুতেই ঢুকতো না। বাড়িতে সেটা সত্যিকারের বলার উপায় ছিল? সবাই গাঁট্টা মেরে মেরে মশাই সেই দুরূহ ব্যাপারকে সোজাসুজি মাথায় ঢুকিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতেন। আমি যে বুঝছি না সেটা বুঝতে তাঁদের ব'য়ে গেছে। কি ঝঞ্ঝাট বুঝুন!

অফিসে ঠিক সময়মত তাড়াহুড়া ক'রে বেরিয়েও ট্রাম বা বাস ধরতে পারলুম না—লোকের ভীড়ে আধ-ইঞ্চি জায়গাতে বুড়ো আঙুল ঠেকিয়ে ব্যালেন্স করতে করতে যে আফিসে পৌছবো তার জো কি? উপ্‌রি উপ্‌রি তিন তিরিক্কে ন'খানা গাড়ি ছেড়ে একখানার পেছনে উঠে কোনক্রমে প্রাণটা নিয়ে গেলুম, মনে করুন, শ্যামবাজারে উঠবার সময় পায়ের গোড়ালি লেগে কাছাটা খুলে

গিয়েছিল, সেটা খোলাই রইল, কারণ দুটো হাত দিয়ে ঝুলছি, একটা দিয়ে যে সেটাকে সামলাবো তার জো নেই. শেষে ড্যালহাউসি স্কোয়ারে নেমে, কোন রকমে কাছাটিকে যথাস্থানে গুঁজে, দৌড়তে দৌড়তে অফিসের তেতালায় উঠলুম ; তাতেও পাঁচ মিনিট লেট। কেন লেট্ তার সত্যি কৈফিয়ৎ দিলুম—এক টাকা ফাইন্ হ'য়ে গেল।

কিন্তু আর একদিন খেয়ে দেয়ে একটু চোখ বুজতেই সত্যি ঘণ্টা দুই লেট্ হ'য়ে গেল, অফিসে পৌঁছলুম অনেক পরে, গিয়ে বললুম পরিবারের প্রসব-বেদনা ধ'রেছিল—সে কি কাণ্ড! ডাক্তার বদ্যি এনে কোনক্রমে সামলেছি, বাড়ি হাসপাতাল—ব্যস্! সব কসুর মাপ হ'য়ে গেল। বড় সাহেব পর্যন্ত খোঁজ নিয়ে গেলেন এখন পোয়াতীর অবস্থা কেমন, কোন ভয়ের কারণ নেই তো? যদি ছেলে হয়েছে বলি তাহ'লে আরো ঝঞ্ঝাট্। বন্ধুবান্ধবরা মাইনে থেকে জোর ক'রে টাকা কেটে নেবে আনন্দ করবার জন্যে, আরও ছ-টা মাসের মধ্যে যে লেট্ হবে না তাও ব'লতে পারি না, তখন ঐ অজুহাতও দেখানো চলবে না, তাই হিসেব ক'রে ছ-মাস থেকে স্রেফ মিথ্যের কারবার শুরু করলুম এবং শেষ পর্যন্ত হবে-হবে জানিয়ে মৃতবৎসা প্রসব করেছেন রটিয়ে বাড়িতে গিন্নীর নাম এবং আফিসে নিজের মান বজায় রেখে দিব্যি চালিয়ে গেলুম। আগে যদি এসব কায়দা জানা থাকতো তাহ'লে ঝঞ্ঝাটের বাবার সাধ্যি কি ঘেঁষে?

এক বন্ধু এলেন সাহায্য-রজনীর টিকিট বেচতে, হাত জোড় ক'রে বললুম যে, ভাই, জীবনে পাসে ছাড়া কখনও পেশাদার

থিয়েটার দেখি নি—বাবা বারণ ক'রে গেছেন, অতএব সখের থিয়েটার দেখতে পয়সা খরচ করি কি ক'রে বল? তাছাড়া আমার অবস্থা বোঝ—দু'টাকা দিয়ে একখানা টিকিট না কিনে সেই পয়সায় যদি ছেলেদের দু'দিন সন্দেশ কিনে খাওয়াই তাহ'লে ওদের একটু গায়ে গত্যি লাগতে পারে—বুঝছো না? এই যায় কোথা—তিনি ঝড়ের মত ক্ষেপে বেরিয়ে গেলেন। বাইরে গিয়ে তিনি যে-যে জায়গায় টিকিট বেচেছেন সেই সব জায়গায় আমার পিতৃপুরুষকে উচ্ছন্ন ক'রে তারপর নাকি টিকিট গছিয়েছেন। খামকা এ কী গায়ে প'ড়ে ঝঞ্চাট জোটে দেখুন তো? দুশো লোকের কাছে চষ্যুণ্ডে ব'লে পরিচয় হ'য়ে গেল। সত্যি অবস্থা খারাপ—এ কেউ বুঝবে না, তাহ'লে করি কি? সত্যি আমার পয়সার দরকার এ কথা কাউকে বলবার জো নেই! কাজ ক'রে পয়সা আদায় করা এক ঝঞ্চাট, পয়সা না-পেয়ে কাজে মন না লাগলেও পাপ। চাকরি-বাকরি না-থাকাতে এক সময় কিছুদিন লেখা শুরু করেছিলুম মশাই—সবাই দেখি ছাপায়, কিন্তু পয়সা চাইলেই দাপায়। যাঁদের নিতান্ত মুখের ওপর কথা বলা অনভ্যাস, তাঁরা শুধু হেঁ-হেঁ ক'রে একটু হেসে ওটা উড়িয়ে দেন। যেন এই তো লেখা, এর জন্যে আবার পয়সা......হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ।

আচ্ছা, তাহ'লে কি করি বলুন দেখি? বন্ধুরা যে সত্যি এমন তাও তো বুঝলুম অনেক ঝঞ্চাট পুইয়ে। একজন এসে একেবারে কেঁদে পড়লেন, কোনক্রমে একশোটা টাকা তাঁকে যোগাড় ক'রে দিতেই হবে—এক মাসের মধ্যে তিনি ফিরিয়ে দিয়ে যাবেন—ভীষণ বিপদ্! বিপদ শুনে মায়া হ'ল—পরে শুনলুম তিনি সেদিন

রেসের পাকা খবর পেয়ে এক ঘোড়া ধরেছিলেন, কিন্তু তাঁর বরাত খারাপ, সেই পক্ষীরাজটি ছুটতে গিয়ে মাঠের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে নাকি গড়াগড়ি দিতে লাগলো। তিনি তার একটি ডিম নিয়ে এসে এখনও ব'সে ব'সে তা দিচ্ছেন—কিন্তু ছানার দেখা নেই। তাঁর কীর্তিকলাপ দেখে আমার চোখ ছানাবড়া হচ্ছে, তাঁর গেরাহ্যি করতে ব'য়ে যাচ্ছে। আজও ভোগাচ্ছেন। সেদিন চাইতে গেলুম, তিনি রেগে ব'লে দিলেন জীবনে তিনি আর আমার মত কাব্‌লেওয়ালা বন্ধুর মুখদর্শন করবেন না। সেই থেকে তিনি আমার মুখও দেখছেন না, নিজের মুখখানাও যাতে আমি না দেখে ফেলি তার ব্যবস্থা ক'রে ব'সে আছেন। আমি যাঁর কাছ থেকে টাকা এনেছিলুম তাঁকে কিস্তিতে শোধ কচ্ছি। অথচ এত ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হ'ত না যদি মিথ্যে ক'রে বলতুম, ভাই, আমার মত লোককে শুধু হাতে কে টাকা দেবে বল ?

আপিসে একটা চাকরি খালি হ'ল, বড়বাবু একদিন বাড়িতে কার বিয়ের সময় নেমন্তন্ন রাখতে এসেছিলেন, অতএব আত্মীয়স্বজন যে যেখানে আছেন তাঁরা ধ'রে নিলেন যে আমার কথায় বড়বাবু বোধ হয় আফিসে ডন্‌বৈঠক দেন, অতএব আমাকে ধরলেই ছেলের একটা চাকরি নিশ্চিত। আমি যদি বলি যে, আমার সেখানে কোন খাতির নেই, তাহ'লেই সবার ধারণা ওটা আমি ছাতি ঢাকা দিয়ে পাওনাদার এড়াবার মত একটা ছল করছি, আসলে কারুর ভাল হয় আমার ইচ্ছে নয়, সব আমার বদমায়েসী, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ কি অকারণ ঝঞ্ঝাট বলুন তো ?

কিন্তু তা না ব'লে যদি বলি, নিশ্চয় তোমার চাকরি ক'রে দোব,

বড়বাবু আমার কথা ঠেলতে পারবেন না, তুমি একটা দরখাস্ত দাও, আমি ভেতরে ভেতরে তারপর আদাজল খেয়ে লাগবো, তাহ'লে বাড়িতে দেখতেন এদ্দিনে তিন থালা তত্ত্ব এসে যেত। হোক না হোক চেষ্টা যে করছি, তা মিথ্যে জেনেও সবার সুখের অন্ত থাকতো না। এখন সত্যি কথার ধালাই নিয়ে মরছি।

কার কাছে সত্যি কথা বলবো? ছেলে, মেয়ে, পরিবার—কারুর কাছে সত্যি বলার উপায় নেই। রাত্তিরে আপিসের কাজ করতে করতে দেরী হ'ল অমনি বড়িতে প্রশ্ন, এত রাত্তির পর্যন্ত কোথায় ছিলে? যদি বলি, আপিসে বাধ্য হ'য়ে থাকতে হয়েছিল, ক্যাশ, মেলে নি! ব্যাস্!—আর যায় কোথা, গিন্নি ফ্যাঁস ক'রে উঠলেন, এদ্দিন মিলছিল আর আজ ক্যাশ মিলছে না?—চালাকি! আসল কথা, এখন যে তাঁর বয়েস হয়েছে, আর তাঁর সঙ্গে মিলবে কেন? বাইরে হুদো হুদো মিলছে—তাই রাতও বাড়তে শুরু করেছে। ফের যদি এ রকম হয় তাহ'লে তিনি আর সদর দরজার খিল খুলে দেবেন না, যেখানে কেষ্ট-রাধার মিল হয় সেইখানেই যেন রাতটা কাটিয়ে আসি। কী ঝঞ্ঝাট, একবার কল্পনা নেত্রে অনুভব ক'রে নিন।

বুঝলাম সত্যি কথা ব'লে ঝঞ্ঝাটের হাত থেকে মুক্তি নেই—সংসার বলতে দেবে না। অত কথা কি বলবো মশাই, ট্রামে পকেটমার আমার পকেটে হাত ঢুকিয়েছে, আমি খপ্ ক'রে সেই হাত ধ'রে তাকে থানায় নিয়ে গেছি, ব্যাপারটা একেবারে ডাহা সত্যি, কিন্তু শেষে আদালতে গিয়ে প্রাণ যায়! সে কি ঝঞ্ঝাট!

একটা চুরির মামলা, কিন্তু তার তারিখ পড়তে পড়তে বছর

ঘুরে গেল, তারপর জেরার ওপর জেরা। চোরের উকিল এমন ধমক
দিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন যে কাঠগড়ায় উঠে
আমারই মনে হ'তে লাগলো বোধ হয় আমিই ও দুষ্কর্মটা করেছি।
সে সব প্রশ্ন কি? শুনে লজ্জায় চোখ-কান লাল হয়ে ওঠে।

কোথায় আপনি ধরলেন, কি ক'রে বুঝলেন ও গাঁটকাটা,
ওর সঙ্গে আপনার কদ্দিনের পরিচয়, আপনি নিজে সেদিন প্রকৃতিস্থ
অবস্থায় ছিলেন কিনা, আপনি কি কি নেশা করেন, ভীড়ের
মধ্যে কি ক'রে হাত চেপে ধরলেন, যদি ঠিক ধ'রে থাকেন তাহ'লে
হাত চেপে ধরা কতদিন প্র্যাকটিস করেছেন, তা না হ'লে এ
অভ্যেস হ'ল কি ক'রে ইত্যাদি ইত্যাদি ক'রে আমায় নাস্তানাবুদ।
প্রাণ যায় আর কি! তখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা; শেষে
মান বাঁচাতে মামলা তুলে নিলুম। কিন্তু সেটা তোলাও কি সহজ
কথা? তাতেও হাজার ফ্যাক্ড়া।

চোর খালাস পেয়ে, অকারণ তাকে হয়রানি করার দরুন উল্টে
আমার নামে মানহানির নালিশ করার ভয় দেখালে, শেষে তার
হাতে পঞ্চাশ টাকা জল খেতে দিয়ে তার উকিলকে গোটা পঁচিশ
টাকা দিয়ে রেহাই পাই। এ রকম ঝঞ্ঝাটে কখনও পড়েছেন?

শীতের আপদ

এবার শীতটা কেমন দেখছেন ?

আপনাদের আর কি বলুন না—পরমেশ্বরের সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্টের দরজা আপনাদের জন্যে খোলা—দু'হাতে যা চাইছেন তাই পাচ্ছেন কিন্তু আমার অবস্থাটা দেখছেন কি ? শীত শুরু হতেই যা ঝঞ্চাট আরম্ভ হয়েছে সে আর বেশি না বলাই ভাল।

দেখুন, গরীবদের জন্যে যেমন দার্জিলিং নয়, তেমনি তাদের জন্যে শীতকালটা না-থাকাই ভাল নয় কি ? আমাদের জন্যে এ ঝঞ্চাটে-ঋতু দেওয়া কেন ? এই ঋতুটি যে এত গোলযোগের ব্যাপার তা যুদ্ধের আগে অতটা বুঝি নি মশাই, যতটা এখন হাড়ে হাড়ে বুঝছি।

সকাল বেলা উঠতে না উঠতে দেখি ৮টা বেজে গেছে—কখনই বা বাজার যাই, চান করি, খাই, মেয়েরাই বা কখন অত সাত সকালে রান্না ক'রে দেয় ? এর ওপর আছে দাড়ি কামানো। এটিকে এড়াবারও জো নেই, অথচ ঘুরে বেড়ানোও ঝঞ্চাট! ওলকচুর মত কুটকুট করবে।

মনে করুন, একে ঠাণ্ডা জলে কামানো—কি ব্যাপার! ইলেক্‌শনের ভোট যোগাড় করার চেয়েও হাঙ্গামার ব্যাপার। ওঃ, কি কষ্ট!

যাঁদের মুখে গজায় না তাঁরা সঠিক মালুম পাবেন না। তার ওপর মনে করুন একখানি ব্লেড—তাতে আগে দেখেছি, মাস দু'-তিন চলতো, এখন একেবারে অচল। তাকে পাথরে ঘ'সে, গেলাসে ঘ'সে, ঝামায় ঘ'সেও দেখলাম, কোন উপায় নেই! এ গালে শুধু ঘসাই সার! শেষে কসাইয়ের মত যদি গালের অর্ধেকটা উপড়ে নিয়ে আসি তবে দাড়ি গোঁফের কিছু যায়।

আপনারা বলবেন যে, তোমারই বা এত কিপ্‌টেমি করা কেন? তা তো বলবেনই, ভগবান তো আমার অবস্থায় আপনাদের কোনদিন ফেলেন নি কিনা? ভগবান যদি শুধু দাড়ি দিয়ে ছেড়ে দিতেন, তাহ'লে নয় যা হোক ক'রে এ বাজারে চালিয়ে দিতুম, কিন্তু তা তো নয়—আমার ভাগ্যের দাঁড়িপাল্লায় যে দুঃখের বাটখারা চাপিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন--সেটা তো আপনারা দেখছেন না?

আপনাদের পয়সা বেড়েছে কিন্তু আমার যে পয়সা নেই। অথচ সবায়ের সন্দেহ আমি চুপি চুপি দু'পয়সা করেছি—আমার সব চাপা। অতএব মূর্খের মত সে টাকা ব্যাঙ্কে না রেখে আরও কত নিরাপদভাবে আমি তা খাটাতে পারি, তার জন্যে পরিচিত ব্যক্তি মাত্রেরই ঘুম হচ্ছে না।

সম্প্রতি তিনজন হিতৈষী বন্ধু ইন্সিওরের ফর্ম নিয়ে আমাকে নাজেহাল ক'রে ছাড়ছেন। তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য আমি মারা গেলে আমার পরিবারবর্গ যাতে দু'পয়সার মুখ দেখতে পারে এবং সব কিছুর একটা সুব্যবস্থা হয়। আমি এখুনি মরলে কত পাব, পাঁচ বছর পরে মরলে কি লাভ হবে এবং বুড়ো বয়সে পঞ্চত্ব পেলে কি ব্যবস্থা হতে পারে, তার ক্রমাগত হিসেব বোঝাতে চেষ্টা

করছেন।—আমিও শুনবো না, তাঁরাও ছাড়বেন না, এ যে কী ঝঞ্ঝাট আপনাদের কি বলবো? বোধ হয় ইন্সিওর করার আগেই আমায় মরতে হবে।

এর ওপর আবার বাড়িতে যে কত রকম উৎপাত তা কি বলবো! মেজ বৌমার ছেলে রোজ তিন ছটাক সরষের তেল মেখে রোদে প'ড়ে থাকবেন, ভাঁড়ারে তাঁর জ্বালায় সরষের তেল রাখবার জো নেই, তাঁর পায়ে প'ড়ে নাকি সবাই বলেছে, 'তুমি যদি বাছা, ছেলের বাবদ এই রকম তেল নাও, তাহ'লে তো কর্তাদের ফেল হতে এ বাজারে দেরী হবে না, দেখছো এখন কচুভাতেতে ভাল ক'রে তেল মাখাতে পারা যায় না, আর তোমার এ কি কাণ্ড? তিনি বোধ হয় কথাটায় রাগ ক'রে আর তেল স্পর্শ করেন না; এখন শুনেছি রোজ পোয়াটাক ক'রে ঘি কম পড়ছে। কি বলবো বলুন!

কাকে ছেড়ে কাকে দেখি! শীত পড়েছে, অতএব ছোট বউমার তিনটে ছেলে আজ সতেরো দিন সত্যাগ্রহ ক'রে ব'সে আছে অর্থ্যাৎ চান করে নি। তাদের দাবী—গরম জল চাই, তা না হ'লে চোত মাসের আগে তারা মাথায় জল ঠেকাতে দেবে না। এখন দুধ গরম করবার মত কয়লা পাওয়া যায় না, তাঁদের জন্যে এখন কোথা থেকে হাঁড়ি হাঁড়ি গরম জলের ব্যবস্থা করি বলুন তো!

এর ওপর নীচের ঘরে ব'সে আছেন এক বুড়ো পিসেমশাই—গলায় কম্ফটর জড়িয়ে, পায়ে মোজা এঁটে, গায়ে ওভারকোট চাপিয়ে তার ওপর বালাপোষ জড়িয়ে। দরজা জানলা সকাল থেকে বন্ধ, কিছুতেই খুলবেন না। তাঁর প্রতিজ্ঞা তিনি দেখবেন কোথা

থেকে হাওয়া ঢোকে। এর ওপর তার ভেতর আবার তিনি তামাক খান—ঘরে ঢোকে কার সাধ্যি? অথচ সেইটি আমার বৈঠকখানা, ছেলেদের পড়বার ঘর। সারা শীতকালটা সেখানে হাওয়া কেন, কোন সুস্থ মস্তিষ্কের লোক ঢুকতে পারে না। মনে করুন, লখিন্দরের লোহার ঘরেও একটা ফুটো ছিল কিন্তু এ-ঘরে সেটুকু ফাঁকও নেই—নর্দমায় দেখি পুরনো মোজা গুঁজে রেখে দিয়েছেন। কেবল প্রকৃতির আহ্বানে তিনি যেটুকু বাইরে আসেন সেই সময় টুকুতেই যা কিছু হাওয়া-টাওয়া ঢুকে পড়ে।

একদিন বললুম, "পিসেমশাই, এ রকম ক'রে থাকলে যে মারা পড়বেন।"

তিনি নির্বিকার চিত্তে বললেন, "পড়লেই বা—তাতে তো আর, হিম লাগবে না।"

এঁকে কি বোঝাবো বলুন!

অতএব শোবার ঘরেই ছেলেদের পড়ার বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছি, ফলে, তারা তিন পাতা পড়ে, আর তিন তিরিক্ষে ন'বার বালিশ বিছানায় গড়িয়ে তাকিয়া বালিশ ফাঁসায়। এর ওপর আবার পারিবারিক হাঙ্গামাটা শুনুন!

ভুঁটে, গোবরা আর ঘেণ্টু—তিনটি ভাগ্নে কাঁধের ওপর ভর ক'রে আছেন, তাদের হাঙ্গামাও পোয়াতে হবে আমায়। শুনলুম তাদের গা শুকিয়ে সেদিন ধুলো উড়তে আরম্ভ করেছিল, তাই আমার ভগ্নী তাঁর পুত্রদের ধ'রে, আমার গৃহিণীর গোপনে সঞ্চিত আধ বোতল তিলের তেল মাখিয়ে, কখন সে ধুলো সাফ করেছেন। আর যায় কোথা!—এই নিয়ে দুই ননদ-ভাজে

দুপুর বেলায় কুরুক্ষেত্র হয়ে গেছে, আমায় আবার বিকেলে দুজনের মাথা ঠাণ্ডা করবার জন্যে আট টাকা সেরের মহাভৃঙ্গরাজ কবরেজি তেল আনাতে হ'ল। তাতেই কি রেহাই পেলুম! গিন্নীর তখুনি মনে পড়ে গেল—

পটকার সাদা সার্ট ছাড়া আর কিছু পরবার নেই, শীতকালে তাতে তো চলবে না—একটা গরম কোট চাই, ক্ষেন্তির জন্যে পাঁচ ছ বছর গরম কিছু কেনা হয় নি অতএব তার একটা লেডিজ কোট নিদেন লেডিজ সোয়েটার, চাকরের কম্বল, লেপের খোল ইত্যাদির বন্দোবস্ত করতে হবে।

যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা কিছু ছিল না, এখন তাই শীত আর ফর্দ দুই কাঁপুনি ধরাচ্ছে। 'ধুত্তোর' ব'লে যে হিমালয়ের দিকে রওনা হব তারও তো উপায় নেই, নিজের তো মাত্র একখানি র‍্যাপার সম্বল। তাই বেগতিক দেখে কাঁপতে কাঁপতে দোকানের দিকেই এগুলুম। যাক্, সেখানে গিয়ে, জামা কাপড়ের দর শুনে তবু একটু শরীরটা গরম হ'ল। শেষকালে মাথাটা গরম হয়ে যেতে অবশ্য খালি হাতে বেরিয়ে এলুম।

মশাই, যা দর বললে, তার মধ্যে অতি খেলো জিনিসগুলো কিনে নিয়ে এলেও আমার মাস তিনেকের মাইনের বেশি। তখন মনে হ'ল কি জানেন, যে ভগবান ভেড়াদের প্রতিও কৃপা করলেন লোম দিয়ে, অথচ আমরা আর সব দিকে প্রায় তাদের মত হ'য়েও রোমশ হ'লে কাজে দিত, সেটুকু উপকার আর তিনি ক'রে দিতে পারলেন না।

দিলেন যে কি তাই ভাবি! শীতকালে কপি, কড়াইশুঁটি

দিতেন, সেটাও এখনকার ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে গুটিয়ে নেবার চেষ্টায় আছেন। একমাত্র বরবটি ছাড়া বাজারে আর গেরস্থর কেনবার মত কিছু নেই। অন্য যা কিছু কিনতে যাই দেখি দোকানী বঁটি নিয়ে গলা কাটবার জন্যে ব'সে আছে।

তাই দিবারাত্র ভাবছি, সে যুদ্ধ তো মিটলো কিন্তু এ লট্‌খটি মিটবে কবে ?



যুদ্ধোত্তর সংসার

খুব শিগ্‌গিরই বুঝলেন, হয় হরিদ্বারের দিকে নয় তিব্বতের পথে দৌড় দিতে শুরু করবো। যাকে বলে সংসারে থাকা আমার পক্ষে অচল। সকলে মিলে আমাকে যদি একহাত দেখে নিতে চান, তাহ'লে আমি তো গেছি!

মশাই, ধর্মঘট হ'ল কর্পোরেশনে, মাঝখান থেকে আমি শুধু ধাঁতানি খেয়ে মলুম! সামান্য জল আনতে কটা দিন কি দুর্ভোগ না গেল বলুন তো? কল থেকে জল বার করা যে এমন গলদঘর্মকর ব্যাপার এ আগে কেউ জানতো মশাই? পাড়ায় টিউবওয়েল ধর্মঘটীদের সঙ্গে সহানুভূতি সম্পন্ন হ'য়ে চুপ ক'রে রইলেন। বে-পাড়ায় গিয়ে চেষ্টা ক'রে দেখলুম, তাও দুটো বদলাতে হ'ল—কারণ জলের বদলে বালি উঠতে শুরু ক'রে দিলে, বুঝলুম গরীবের বরাতই এই, শুধু তাদের গুড়ে বালি পড়ে না—জলেও পড়ে।

ক'দিন এই রকম সুখে কাটাতে কাটাতে চলেছি, লক্ষ জঞ্জালে-ভরা রাস্তার সৌগন্ধে প্রাণ যখন ভরপূর হ'য়ে আছে, কলেরায় মরবো, কি টাইফয়েডে মরবো ভেবে ঠিক ক'রে উঠতে পাচ্ছি না, ঠিক সেই সময় দয়া ক'রে আমার উপকার করবার জন্যে কে আবার পাড়ায় একটি বেতো পক্ষীরাজ ঘোড়া ছেড়ে দিলেন।

সেটা আমার বাড়ির সামনে এসে তিনপাক টাল খেয়ে, চোখ-মুখ পাল্টে সেই যে চিৎ হ'য়ে শুলো, আর উঠলো না। কি আপদ বলুন তো? ধর্মঘট ভাঙতে দয়া ক'রে ধাঙ্গড়রা তিন দিন পরে সেই পচা মাল তুলে নিয়ে গেল তাই রক্ষে। ছেলেপুলেদের কথা ছেড়ে দিন, আমরা ক'দিন ঘোড়া-ভূতের স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুমুতে পারি নি। আমার কি রকম ভাগ্যটা শুধু দেখে যান, মরবার সময় ঘোড়াতেও একটা চাট্ মেরে গেল। যা বীজ ছড়িয়ে গেছে তার থেকে গুষ্টিটা বাঁচলে হয়!



এর ওপর আবার লোকের আনন্দ কত? মরছি নিজের জ্বালায় তার মধ্যে আবার রাস্তায় যার সঙ্গে দেখা হয় সেই জিগ্যেস করে, 'হ্যাঁ মশাই, আজকের রেজাল্ট কি হ'ল?"

ভাবলুম ভদ্রলোক ধাঙড়দের মিটিংটার কি ফল হ'ল তাই বুঝি জিজ্ঞাসা ক'রছেন, বললুম, 'আজকেই সব ফয়সালা হ'য়ে যাবে বোধ হয়।'

তিনি চোখমুখ কপালে তুলে ব'লে উঠলেন, "বলেন কি? আজকেই সব কটা 'উইকেট' ডাউন্ হ'য়ে গেল নাকি?"

তখন বুঝলুম, ও বাবা, এ যে অন্য-রাজ্যের লোক! এর মাথায় এখন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট খেলোয়াড়রা ভর করেছেন। এক ভারত মহাদেশকে নিয়ে অস্থির, তার ওপর জুটেছে অস্ট্রেলিয়া— আর দেখতে হবে কিছু? অতঃপর গলি দিয়ে স'রে পড়াই

যুক্তিযুক্ত। সরলুমও তাই। ভদ্রলোককে উইকেটের খবর না দেওয়াতে আমাকেই বোধ হয় তিনি খুব 'উইকেড্' ভাবলেন। কিন্তু করি কি ?

সত্যি বলুন তো, এই বাজারে সংসার আমাদের যে-ভাবে ব্যাটিং করতে শুরু করেছে, এর ওপর আবার মাঠে কারা ব্যাট্ পিটুচ্ছে তা দেখতে ইচ্ছে করে ?

ইচ্ছে করলেও টিকিট কিনি কি ক'রে ? বাঁধা মাইনে, আ-বাঁধা খরচ। দুপুরে একটু বেশি টিফিন খেয়ে ফেললে মাসের শেষে হিসেব মেলাতে পারি না, এর ওপর দেখছি, আজকাল ফুটবল, ক্রিকেট, সিনেমা, সাহিত্য, কাব্য সব কিছুর খবর না রাখলে সভ্য-সমাজে কোথাও মুখ খোলবার জো নেই।—এ কি ঝঞ্ঝাট বলুন তো ?

আমি মশাই না বড়লোক না অতি গরীব; পরিচয়ের খাতিরে মধ্যবিত্ত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমার কোন বিত্তই নেই, কোন রকমে পিত্তটি রক্ষা ক'রে চলেছি, তাও চারিধারের চাপে প'ড়ে ছরকুটে যাবার উপক্রম হয়েছে। কি করি ?

সব দিক দিয়ে হয়েছে আমার বিপদ—এই দেখুন না, পট্‌কাটা এইবার এগজামিন দেবে, কিছু পড়াশোনা করবে না। বললেই বলবে, "তুমি বই কিনে দিয়েছ ?"

আমি যদি চ'টে বলি, "যা দিয়েছি সেইগুলো পড়েছিস ?" তার উত্তর তার মুখে একেবারে যুগিয়ে আছে, বলবে, "মাস্টার মশাই ব'লে দিয়েছেন সেগুলো থেকে কিছু পড়বে না।"

গিন্নী ঝাঁঝিয়ে ব'লে উঠলেন, "তোমারই তো দোষ, ওদের দু'খানা পড়ার বই কিনে দিতে পার না ?"

আমি তার উত্তরে বলি, 'সে সব ছাপা নেই।' গিন্নী তাতে আরও ক্ষেপে উঠে মুখ ভেঙিয়ে বলেন, "না, ছাপা নেই, ইস্কুলে যা বই পড়তে দেয় তা ছাপা হয় না।"

আমি যত বলি, 'আজকাল তাই রেওয়াজ হয়েছে।' তা কেবা শোনে কার কথা—সব্বার একসঙ্গে চীৎকার। তাহ'লে ছেলেকে পাস করাতে গেলে আমাকে এখন গ্রন্থকারদের ঠিকানা খুঁজে খুঁজে হয় বাঁশবেড়ে নয় বরিশালে গিয়ে তাঁদের কাছ থেকে কি বই লিখেছেন তাই টুকে টুকে নিয়ে আসতে হয়! তাই করবো? বলুন।

এ কী সব অকারণ ঝঞ্ঝাট বলুন তো ?—ইস্কুলে বই দেবে তা ছাপা হবে না, ডাক্তারে ওষুধ লিখে দেবে তা তৈরী হবে না, সরষের তেল আনলে তার ঝাঁজ থাকবে না, বরং সেটা তেলওয়ালার বেশি থাকবে, আলু এনে ঝোল করলে তা আবার আখরোটের মত হাতুড়ি দিয়ে না-ভেঙে খেতে পারা যাবে না, কল থাকলে জল পাওয়া যাবে না, খেটে মরলেও কেউ পয়সা দেবে না, দুঃখের কথা কেউ শুনবে না, লিখলে পড়বে না, তাহ'লে এ সংসারে আমার বেঁচে থাকার প্রয়োজনটা কি তাই ভাবি!



তাও কি এ সবের প্রতিকারের বিষয় নিশ্চিন্তে ভাববার জো আছে ? ক্ষেন্তি

ফ্রক্ প'রে ধেই ধেই ক'রে নাচতে নাচতে ছুটে এসে দাঁড়ালো! কি সংবাদ? 'না—বাবা সমপাতন, জ্যা, প্রতীপকোণ, বিষুব-সংক্রান্তি, নিপাতন সিদ্ধ, আমার গুষ্টির পিণ্ডি এগুলো ঠিক ক'রে বুঝিয়ে দাও—ইস্কুলে বড়দি বলেছেন এবার এগুলো আমাদের পরীক্ষায় পড়বে।'

বুকটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠলো—ক্ষেন্তি বলে কি? তারপরে দেখলুম তার হাতে জ্যামিতির বই! কি সর্বনাশ! এ বোঝাব কি ক'রে? যদিও অবশ্য থার্ড ক্লাসের বেশি পড়িনি কিন্তু আর পাঁচজনকে তো পড়াশুনা করতে দেখেছি কিন্তু এই সব বিষুবসংক্রান্তির অশান্তি যে কোন্ ফাঁকে একালের জ্যামিতির মধ্যে ঢুকেছে তা তো খেয়াল করি নি!

বুঝলুম, 'তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়!' ক্ষেন্তির পাসের আশা নেই। তাই তখন বড্ড ঘুম পাচ্ছে ব'লে পাশ বালিশটা টেনে শুয়ে পড়বো কিনা তাই ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ যেন উত্তর-মেরু থেকে একটি সাদা ভালুকের ছানা বেরিয়ে এসে চোখের সামনে হাজির।

অর্থ্যাৎ সর্বাঙ্গে তুলো মেখে পান্তুর প্রবেশ। তার পশ্চাতে পান্তুর জননীর আগমন এবং এসেই পুত্রের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে আমার উদ্দেশে অমৃত বর্ষণ, "কদ্দিন থেকে তোমায় তোষকের টিকিন আনতে



বলেছি তা সেদিকে কি তোমার কোন হুঁস্ আছে? কেবল বল যুদ্ধ মিটুক! এখন দেখ কাণ্ড; শীতের রাতে কখন ছেঁড়া-খোলটার ভেতর ও ঢুকে গেছলো, সেটার আর পদার্থ নেই কিছু,—এর পর আর তুলোও থাকবে না। আজ আফিস থেকে ফেরবার সময় ৮ গজ টিকিন কিনে নিয়ে তবে আসবে।"

তক্ষুনি রাজী হয়ে বেরিয়ে পড়লুম কারণ তা না হ'লে মশারিটির দিকে তাঁর নজর পড়লেই গেছি। সেটি সবই ছেঁড়া-ন্যাকড়ার তালি দিয়ে তৈরী হয়ে গেছে, কেবল মাঝে মাঝে দু'একটা জালির ফোঁকর আছে। বাইরে কেউ ডাকলে সেইখান দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে হয় কে ডাকছে। সেটির ফর্দ পেশ করলেই একেবারে চরম হ'ত—অতএব তাড়াতাড়ি সহধর্মিণীর কাছ থেকে স'রে প'ড়েই কি খুব বুদ্ধিমানের কাজ করি নি দাদা?

হাসপাতালে হাঁসফাঁস

কেমন কাটাচ্ছি, জানতে চান তো? বেশ স্বচ্ছন্দে কেটে যাচ্ছে। দিনে তিনবার ক'রে হাসপাতাল আর তিনশো পঁয়ষট্টিবার হাসপাতালের ডাক্তারবাবুর বাড়ি ছোটাছুটি ক'রে মরছি।

ছেলে মিটিঙে গিয়ে ঠ্যাং ভেঙে এসেছেন। অক্ষত অবস্থায় বেরিয়েছিলেন, যখন ফিরে এলেন তখন দেখলুম একটা ঠ্যাং নড়বড় করছে। কি অবস্থা বুঝুন!—বাঙালীর ছেলের একমাত্র ভরসা দুখানি শ্রীচরণ, তার মধ্যে একটিকে একরকম খুইয়ে এল! তাড়া করলে যে ভবিষ্যতে ছুটে পালাবে, তার দফা গয়া! দেখুন দেখি কি ঝঞ্ঝাট!

তুই গেছিস মিটিঙে, সেখানে চুপ ক'রে গিয়ে একটু দাঁড়া। তার ব'য়ে যাচ্ছে। সকলের শেষে এসে সক্কলের আগে গিয়ে বসব, আবার সবাই বেরিয়ে যাবার আগে নিজে আগে বেরিয়ে পড়ব, এ কি বদ অভ্যেস বলুন তো? এতটুকু যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকে! তেমনই হ'ল, ভিড়ের চাপে ল্যাং মেরে দিলে কে তার ঠ্যাঙের দফা সেরে!

বার বার ব'লে আসছি, ওরে বাপু, ও রকম করিস নি, একটু ভব্যতা শেখ, চ্যাংড়ামো করাটাই খুব বীরত্ব প্রকাশ নয়! তা কেবা শোনে কার কথা! বাপ বকছে কি গাধা ডাকছে—সেইটেই

ছেলেরা আজ পর্যন্ত আলাদা ক'রে ভাবতে পারলে না, তা আমি কি করি বলুন ?

তার ওপর রয়েছেন ওদের মা। কিছু বললেই বলবেন যত বুড়ো হচ্ছ, তত তোমার টিকটিক করা স্বভাব হচ্ছে, ওই জন্যেই তো ছেলেপুলেরা ওই রকম ব্যাদড়া হয়। যেন টিকটিক না ক'রে বাবাজীবনদের তামাম টিকে ধরিয়ে গুড়ুক ফোঁকবার আয়োজন ক'রে দিলেই সব ঠিক হয়, ছেলেপুলেরা ঠাণ্ডা থাকে, প্রায় এই রকম ভাবটা আর কি। সেটা ক'রে উঠতে পারলুম না, তাই মাসখানেক একেবারে চুপচাপ মেরে রইলুম। যা খুশী কর বাবা, কিচ্ছু কথাটি কইব না! তার ফল তো হ'ল ওই। এখন ঠ্যাং জোড়বার জন্যে ডাক্ বাবাকে!

এ কি মলাটের পাতা যে খানিকটা আটা দিয়ে জুড়ে দোব ? হাসপাতালে দিতেই হ'ল। আকাশ-পাতাল ঘুরে বহু লোকের পায়ে ধ'রে তো কোনক্রমে একটা বেড্ যোগাড় করতেই হেড্ খারাপ হবার মত হ'ল। ডাক্তারবাবুরা দেখে বললেন, 'এক্সরে' করতে হবে। করা হ'ল। করকরে বত্রিশ টাকা বেরিয়ে গেল। তারপর কতকগুলো ওষুধের ফর্দ দিলেন, ডিসপেন্সারীর লোকগুলোই হা-রে-রে-রে ক'রে কোত্থেকে যে সত্তর-আশি টাকা ছোঁ মেরে নিয়ে গেল তা বুঝতে পারলুম না। তারপর নার্সকে দাও, মেথরকে দাও, দারোয়ানকে দাও, এটা আনো, ওটা আনো করতে করতে আরও শ দুয়েক টাকা বেরিয়ে গেল। এ দেশের দাতব্য হাসপাতাল কিনা!

যাই হোক, এর ওপর আবার মুশকিল—যখন তখন ফস্ ক'রে

যাওয়া যাবে না, ঘন্টি দিলে বেরিয়ে আসতে হবে, সে কত রকমের আইনকানুন! তিতিবিরক্ত হয়ে ডাক্তারবাবুকে একদিন ব'লে ফেললুম, মশাই, এবার একে বাড়ি নিয়ে যাই, বিশেষ তো কিছু হয় নি ব'লে মনে হচ্ছে। তিনি সে কথা শুনে এমন ভাবে আমার মুখের দিকে চাইলেন যে, মনে হ'ল, আর একটু দৃষ্টি স্থায়ী হ'লে আমাকেও বোধ হয় ওই হাসপাতালের একটা বেডে শুয়ে পড়তে হবে।

ফস্ ক'রে কথাটা ব'লেই ভাবলুম যে কাজটা হয়তো ভাল করলুম না, রাত্তিরে ছেলেটা একা থাকে, শেষকালে ডাক্তার চট্‌লে হয়তো, সারাতে পারুক না পারুক, গোটাকতক ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে জব্দ করবে, আর নার্স-টার্সও হয়তো থাকবে না সেদিকে। তারপর ছেলের মুখে শুনলুম যে, এমনই না বললেও কেউ থাকত না। ওদের সব টাইম বাঁধা কিনা!—জলতেষ্টা বা অন্য প্রয়োজনাদি সারবার টাইম বাঁধা আছে। রুগীকে সেই ডিসিপ্লিন মেনে চলতে হবে, পাঁচ-দশ মিনিট এদিক ওদিক করেছে কি নিজেই যা খুশী বিছানায় শুয়ে শুয়ে ক'রে যাও।

আবার বুঝে বুঝে আমার ছেলেটির যিনি সেবার ভার পেয়েছিলেন, তিনি একেবারে ভারতের মহিয়সী মহিলা। কি কড়া চোখ মুখ চোয়াল, কোথাও এতটুকু স্যাঁতসেঁতে ভাব নেই। মেয়েমানুষ যে এত খটখটে কি ক'রে হয়, তা তাঁকে না দেখলে বুঝতে পারতুম না। রোগীরা বলে যে একজন ফোড়া অপারেশন করতে এসেছিল, কিন্তু হঠাৎ সেই নার্সটির শ্রীমুখপঙ্কজ দেখেই তার ফোড়া ফেটে গিয়েছিল, তাকে আর টেবিলে শুতে হ'ল না। তিনি, মনে

করুন, করছেন আমার ছেলের সেবা। অথচ যেগুলি সত্যিকারের ভাল, যাদের মুখের দিকে রোগীরা রোগ ভুলে খানিকটা চেয়ে থাকে, তারা সেদিকে নেই, বোধ হয় পয়সাওয়ালা রোগীদের ভাগে পড়েছে। অথচ আমার দেখুন বিপদ!

ছেলেকেই বা কি বলি আর অজানা মেয়েদের ডেকেই বা তার কর্তব্য বোঝাই কি ক'রে? অভ্যেস নেই তো। শেষে গিন্নীকে দেখাতে নিয়ে এলুম, তিনি একটু নার্সকে কর্তব্য বোঝাতে গেলেন, তার উত্তরে সে দু-একটা কড়া কথা শুনিয়ে দিলে গিন্নীও ছাড়বার পাত্রী নন, তিনি আবার জবাব দিলেন। উত্তরোত্তর ব্যাপারটা ঘন হয়ে উঠল। আমি তো ব্যাপার দেখে নিরুত্তর; শেষে সত্বর একটা ট্যাক্সি ডেকে কোন মতে পুত্র পরিবার সমেত সোজা হাসপাতাল থেকে নাম কাটিয়ে বাড়ি চ'লে এসে বাঁচি। শেষে কি হাসপাতালে একটা দাঙ্গা বাধিয়ে পুলিস-কেসে পড়ব?

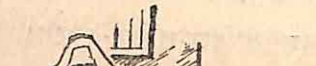
গিন্নীর কি? কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায় তা তো জানেন না! আমাকে যে হাড়ে হাড়ে বুঝতে হচ্ছে। তিনি তো বাড়ি এসে খুব চীৎকার শুরু করলেন, তুমি যে তাড়াতাড়ি আমায় নিয়ে এলে, তা না হ'লে আমি ওকে ওপরওয়ালাদের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে আগা-পাস্তলা একবার দেখে নিতুম।

আমি শেষে বললুম, যাক, সংসারে অনেক কিছু ভাল ভাল জিনিস দেখবার আছে, খামকা ওকে দেখে নিয়ে আর কি হবে, তুমি এখন ছেলেপুলেগুলোকে দেখ!

তিনি কথাটা বোধ হয় পছন্দ করলেন না, রেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন দেখলুম।

ছনিয়াতে আমার আর দেখতে কিছু বাকি রইল না, বুঝলেন ? ছেলেপুলেদের কাণ্ড দেখলুম, গিন্নীর মেজাজ দেখলুম, বন্ধু-বান্ধবের ব্যবহার দেখলুম, স্বদেশবাসীর কর্তব্যপরায়ণতা দেখলুম, লোকের পেছনে খামকা লাগার উৎসাহ দেখলুম, নিজেদের শৃঙ্খলা-রক্ষার হুশ্চেষ্টা দেখলুম, লোকের ভদ্রতা দেখলুম, আহাম্মকদের প্রচারের জোরে নামজাদা হতে দেখলুম, দাতব্য চিকিৎসালয়ে দাতাকর্ণদের দেখলুম, শুধু দেখতে পেলুম না আপনাদের দয়াময় করুণার অবতার ভগবানটিকে—যিনি আমার পেছনে হপ্তার পর হপ্তা ঝঞ্চাট বাধিয়ে মজা দেখছেন।

একবার দেখা হ'লে শুধু একটি কথা তাঁকে বলব, মশাই, খুব ভদ্দরলোক যা হোক !



রান্নার কান্না

চাকরি করতে গেলে ঝঞ্ঝাটের তো অবধি নেই কিন্তু চাকরি চেয়ে যে বেশি ঝঞ্ঝাট হয় এবারে সেই অভিজ্ঞতা হ'ল। আমার অপরাধ, কিছুদিন পূর্বে কর্মপ্রার্থী হ'য়ে খবরের কাগজে একটি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলুম এই ব'লে যে, জনৈক শিক্ষিত ভদ্রলোক যে-কোন নির্ঝঞ্ঝাটের চাকরি ক'রতে প্রস্তুত, কেরানীগিরি বাদ কোন কাজে আপত্তি নাই।

ব্যস্! আর যায় কোথা—সকাল সন্ধ্যে বাড়িতে চিঠি আসতে লাগলো—তার মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জনের তাগাদা—একটি রসুয়ে বামুন চাই!

বর্তমানে যে এই পদ এত খালি রয়েছে এই প্রথম উপলব্ধি করলুম, বুঝলুম যে বর্ণহিন্দুদের জন্যে যাবতীয় চাকরি বন্ধ হ'য়ে যাক্, পুরুত-গিরি আর রসুয়ে বামুনগিরি করবার জন্যে লোকের দরজা সর্বদা খোলা থাকবে। চিঠিতে তাগাদা ক'রেও অনেকে যখন জবাব পেলেন না তখন সকাল সন্ধ্যে বাড়িতে এসে উৎপাত শুরু করলেন—শেষে খোলা গায়ে বেরিয়ে এসে বললুম, মশাই, আমি বামুন নই, দেখছেন না পৈতে নেই! তাঁরা তবুও নাছোড়বান্দা, বলেন, চুলোর দোরে যাক্ পৈতে—যাবার সময় একছড়া কিনে দেব। আর মশাই বাড়িতে একটা লোক না হ'লে তো টেঁকা যাচ্ছে

না। নিরুপায় হ'য়ে বাইরে চ'লে গেলুম। তাতেও কি নিস্তার আছে ?

একটি মহিলা অতি করুণভাবে আবেদন জানিয়ে লিখলেন যে, তাঁদের বাড়িতে একটি রাঁধুনির পদ খালি, আমি যেন অবিলম্বে গ্রহণ করি, তিনি নাকি এদ্দিন আমার মতই একটি লোক খুঁজছিলেন। মাত্র গুটি পঁচিশ লোক খেতে, মেয়েরাও আমার কাজে সমানে সাহায্য করবেন, আমিও তাঁদের সঙ্গে খেয়ে প'রে বেশ সুখে থাকবো। উপরন্ত আঠারো টাকা মাইনে, বছরে দু'খানা বাঁদিপোতার গামছা, সকাল বিকেল দু কাপ চা. একেবারে যাকে বলে জামাই আদর। এর পূর্বে যে ঠাকুর মশাই কাজ করতেন তিনি নাকি মিলিটারীতে চ'লে গেছেন এবং তাঁর মাসিক বরাদ্দ ছিল মাত্র টাকা দশেক। আমি যেহেতু শিক্ষিত ভদ্রলোক ও উদার ভাবে যে-কোন ঝঞ্ঝাটবিহীন চাকরি গ্রহণে ইচ্ছুক, সেই হেতু তিনি আমার বেকার অবস্থা ঘুচিয়ে সূপকার অবস্থায় পরিবর্তিত করতে চান।

বুঝুন বিপদ! ভদ্রমহিলাকে লিখে দিলুম, অশেষ ধন্যবাদ, ও-কার্য বাধ্য হ'য়ে যদি আমাকে কোনদিন করতে হয় তাহ'লে আগে আপনার কাছ থেকে একখানি বাঁদিপোতা চেয়ে নিয়ে ঝুলে পড়বো সেও ভাল, তবু ও-ঝঞ্ঝাটের ব্যাপারে আমি নেই।

আপনারা হয় তো বলবেন, ঐ তো বাঙালীর দোষ, পঁচিশ টাকায় সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যে ছ'টা পর্যন্ত কলম পিষবে, সেটা ভাল, তবু ছোট কাজ ব'লে রাঁধুনীর কাজ করবে না।

রাঁধুনির কাজ ছোট কাজ কে বলে মশাই? আজ দেখছেন না, বাড়িতে বাড়িতে মেয়েরা তাঁদের পতিদেবতার চেয়ে এখন বামুনঠাকুরদের আশায় উনুনের ধারে ব'সে ধোঁয়া খেতে খেতে চোখের জল ফেলছেন! চতুবর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠবর্ণের হাতে যে এ-ভার হিন্দুরা চাপিয়েছেন তার কারণটা কি? তার একমাত্র কারণ—এ একটা তপস্যা, সব চেয়ে ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার! এ ঝক্কি ব্রাহ্মণ ছাড়া অ-ব্রাহ্মণের পক্ষে টানা অসম্ভব—বিশেষ এ যুগে।

এখন মনে করুন, বাজারে মাল নেই অথচ সু-খাদ্য রান্না করতে হবে, কয়লার আঁচ নেই তবু ভাত সেদ্ধ করা চাই, কেরোসিন নেই তবু উনুন জ্বালাতে হবে, সরষের তেল নাকে দিয়ে ওপরওয়ালারা এমন ঘুমচ্ছেন যে তাঁদের গোঁফ-দাড়ি চুঁইয়ে যদি ছিটে খানেক কোনদিন গড়িয়ে পড়ে, তাহ'লে তাই দিয়ে মাছ ভাজতে হবে, এ-সব কসরৎ কি চাট্টিখানি ব্যাপার ব'লে মনে করেন?

তারপর আরও আছে—হাঁড়ি ফাটবে না অথচ সেটা সারাদিন উনুনে রাখা চাই। সমস্ত গুষ্টির তিনবার ভাত চাপানো হবে, বেশি নুন কোন তারকারিতে পড়বে না অথচ আলোনা হ'লে মাথা গেল। ঝাল কম হ'লে বড় কর্তা ক্ষেপে যাবেন, ঝাল বেশি হ'লে ছেলেপুলেরা মুখে দিয়েই নাচতে শুরু করবে আর মেয়েরা ঠাকুরের শ্রাদ্ধ করতে থাকবেন, অতএব তরকারির এক দিকটা ঝাল আর এক দিকটা আ-ঝাল রাখার কায়দা জানা চাই।

আলুভাজা কেউ মোটা খেতে ভালবাসেন কেউ শুধু ঝুরি। কেউ কেউ ঢেঁড়স চচ্চড়ি ভাতের সঙ্গে না-হ'লে খেতে পারেন না। কেউ

ঢেঁড়স পাতে পড়লে ভাতের থালা ফেলে দিয়ে চ'লে যান—কেউ মাছ ভাজা চান, কেউ মাছের ঝোল না পেলে গোলমালে বাড়ি মাথায় করেন, অথচ বাজার থেকে ঘুসো চিংড়ি ছাড়া গেরস্তর আর কোন মাছ কেনার হেক্‌মৎ নেই।

ঘি দুষ্প্রাপ্য, অথচ তাই দিয়ে সব কিছু সাঁতলাও ; তেল অখাদ্য, তা হ'লেই বা, তবু বাবুদের তাই দিয়ে মিষ্টি তরকারী রেঁধে দিয়ে যাও, তা না হ'লে বেলা দেড়টা পর্যন্ত রেঁধে শোন, 'রান্না কিচ্ছু হয় নি, এর চেয়ে গরুর জাবনা খাওয়া ভাল।'

এ তো গেল এক পর্ব। দ্বিতীয় পর্ব সে আরও সুমধুর।

বাসন-মাজার ঝিয়ের সঙ্গে তো সতীনের সম্পর্ক, তার সঙ্গে ঝগড়া এ তো লেগেই আছে। রান্নার আগে প্রয়োজন বাসনের—তার ব'য়ে যাচ্ছে ! আগে দরকার দুটো বাটির, সে বেলা সাড়ে আটটার সময় এসে মাজতে বসলো থালা, যখন থালার জন্যে মাথা ফাটাফাটি, সে তখন মেজে চলেছে ঘটি।

চাল ধোবার দরকার—কলে জল নেই ! জল এলো তো এগারো জন কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে। মাথা ধুতে ধুতেই আপিসের টাইম্ এসে গেল। এদিকে ন'টার মধ্যে চোব্য চোষ্য তৈরী চাই—ওদিকে এত চর্ব্বোর পর চোষ্য জিনিস একটিও নেই—নিজের বুড়ো আঙুলটি ছাড়া, তাও পুড়লো হয়তো ভাতের হাঁড়ি নামাতে গিয়ে, তিন দিন ঘা শুকোল না।

রান্নাঘরে গরম কড়া হাঁড়ি নামাবেন তার জন্যে তো একটু ন্যাকড়া চাই ? তা পাচ্ছেন কোথায় ? কাপড় নেই। এর চেয়েও কত প্রয়োজনীয় ব্যাপারের জন্যে এক টুক্‌রো কাপড় পাওয়া

ঢেঁড়স পাতে পড়লে ভাতের থালা ফেলে দিয়ে চ'লে যান—কেউ মাছ ভাজা চান, কেউ মাছের ঝোল না পেলে গোলমালে বাড়ি মাথায় করেন, অথচ বাজার থেকে ঘুসো চিংড়ি ছাড়া গেরস্তর আর কোন মাছ কেনার হেক্‌মৎ নেই।

ঘি দুষ্প্রাপ্য, অথচ তাই দিয়ে সব কিছু সাঁতলাও; তেল অখাদ্য, তা হ'লেই বা, তবু বাবুদের তাই দিয়ে মিষ্টি তরকারী রেঁধে দিয়ে যাও, তা না হ'লে বেলা দেড়টা পর্যন্ত রেঁধে শোন, 'রান্না কিচ্ছু হয় নি, এর চেয়ে গরুর জাবনা খাওয়া ভাল।'

এ তো গেল এক পর্ব। দ্বিতীয় পর্ব সে আরও সুমধুর।

বাসন-মাজার ঝিয়ের সঙ্গে তো সতীনের সম্পর্ক, তার সঙ্গে ঝগড়া এ তো লেগেই আছে। রান্নার আগে প্রয়োজন বাসনের—তার ব'য়ে যাচ্ছে! আগে দরকার দুটো বাটির, সে বেলা সাড়ে আটটার সময় এসে মাজতে বসলো থালা, যখন থালার জন্যে মাথা ফাটাফাটি, সে তখন মেজে চলেছে ঘটি।

চাল ধোবার দরকার—কলে জল নেই! জল এলো তো এগারো জন কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে। মাথা ধুতে ধুতেই আপিসের টাইম্ এসে গেল। এদিকে ন'টার মধ্যে চোব্য চোষ্য তৈরী চাই—ওদিকে এত চর্ব্বোর পর চোষ্য জিনিস একটিও নেই—নিজের বুড়ো আঙুলটি ছাড়া, তাও পুড়লো হয়তো ভাতের হাঁড়ি নামাতে গিয়ে, তিন দিন ঘা শুকোল না।

রান্নাঘরে গরম কড়া হাঁড়ি নামাবেন তার জন্যে তো একটু ন্যাকড়া চাই? তা পাচ্ছেন কোথায়? কাপড় নেই। এর চেয়েও কত প্রয়োজনীয় ব্যাপারের জন্যে এক টুক্‌রো কাপড় পাওয়া

যাচ্ছে না আর ভাতের হাঁড়ি নামাবার জন্যে মিলবে কাপড় ? এত ক'রে যদি বামুনগিরি করতে পারেন করুন !

তাই তো ভাবি যে পৃথিবীতে এর চেয়ে ঝঞ্ঝাটের কাজ বোধ হয় আর নেই। আমি তো মশাই হাড়ে হাড়ে ভুক্তভোগী। একবার চড়ুইভাতিতে রান্না করতে গিয়ে যে আক্কেল-সেলামি দিয়েছি তা আর কহতব্য নয়।

মশাই, এগারজন লোকের রান্নার ভার আমার ওপর। ভরসা একমাত্র মনের জোর আর একটি 'পাক-প্রণালী'। বই মিলিয়ে মিলিয়ে মনে করুন পঞ্চ ব্যঞ্জন রাঁধলুম, কিন্তু বরাত এমন, বেলা তিনটের সময় সেই প্রচণ্ড ক্ষিদের মুখেও বন্ধুরা খেতে ব'সেই উঠে পড়লেন—একটা জিনিসও নাকি মুখে দেবার জো নেই! দশ বারো টাকার খাবার বাজার থেকে এনে সবার পেট ঠাণ্ডা করতে হ'ল।

বাকি ছিল খান কতক পাঁপর, ভাবলুম যাক্, এইগুলো তাড়াতাড়ি ভেজে এদের মান বজায় রাখি। কিন্তু কি সর্বনাশ, পাঁপর ভাজার যে এত সাজা তা কি আগে জানতুম মশাই ? আড়াই সের তেলে একখানা ক'রে পাঁপর ছাড়ি আর তারা সবাই নেতিয়ে থাকে, কেউ আর খড়খড়ে হবার নাম করে না। মশাই, ভেজে ভেজে সেগুলো কালো হ'য়ে গেল তবু শক্ত কাঠ হ'ল না। দুত্তোর ব'লে কড়া-ফড়া উল্টে সব কিছু অগ্নিদেবের গর্ভে দিয়ে সেদিনকার মত চ'লে এলুম, ভাবলুম পরের দিন পাঁপর-ওয়ালাকে একবার দেখে নেব। রাত্তিরে গিন্নীর কাছে বলতে তিনি তো একেবারে হেসে লুটোপুটি। বললেন, "আ পোড়াকপাল, পাঁপর

বুঝি গরম তেলে ফেলে রাখলে শক্ত হয়? ওকে জুড়ুতে দিতে হয়।" শুনে একদম হাড় জুড়োল আর কি!

সেই থেকে রান্নার কথা শুনলেই কান্না আসে আর এই ঝঞ্ঝাট নিত্য যাঁরা পোয়ান তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধায় চিত্ত গদগদ হ'তে থাকে। তা না হ'লে ভাবুন আজও গৃহিণী নিরানব্বইবার অকারণে মুখ-ঝাম্‌টা দেবার পর একবার তাঁর দিকে সক্রোধে চেয়েই বাড়ি থেকে ঘণ্টাখানেকের জন্যে হন্‌হন্‌ ক'রে বেরিয়ে চ'লে যাই তবু একটু উঁ-আঁ শব্দ করতে ভরসা করি না?

আশার নেশা

অনেক আশা ক'রে সংসার-দাবার ছকের মধ্যে প্রবেশ ক'রে ছিলাম মশাই, কিন্তু তখন কে জানতো আশার নেশা আফিংয়ের নেশাকেও হার মানায়—আশা পূর্ণ তো হয়ই না, বরং তার ওপর ভরসা ক'রে চললে ঝঞ্ঝাটের ঠেলায় আরও কোণঠাসা হ'য়ে দিন গুজরাণ করতে হয়।

যুদ্ধ থেকেই তো আমার ঝঞ্ঝাটের অন্ত নেই; না ছিল কেনা লোহা, না ছিল ব্যবসা! এমন কি যদি বুদ্ধি ক'রে পোস্ট অফিস থেকে কিছু কুইনিন কিনেও রেখে দিতুম তাহ'লে আমায় পায় কে? আজ ক'লকাতায় একখানা বাড়ি না হোক অন্ততঃ বালিগঞ্জে কাটা তিনেক জমি তো থেকে যেতই! কিন্তু জন্মভোর চাকরি ক'রে ভরসা হ'ল না সেটাকে ছেড়ে এই সব ব্যবসাতেই তেড়ে লেগে যাই। স্রেফ দশটা পাঁচটার মোহেই কাটিয়ে দিতে গেলুম, তার ফলে এখন রিট্রেঞ্চমেন্টে নিজের চাকরি যাবে কিনা তাই ভাবছি আর দেখছি যে-গুলোর তখন চাকরি-বাকরি, কিছু ছিল না, সেগুলো এখন গোঁফে চাড়া দিয়ে বাহাদুরী দেখিয়ে জীপে ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

জিনিস-পত্তরের যা দাম তাতে তো সেগুলির সঙ্গে ভাসুর-ভাদ্দর-বউ সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে, কিচ্ছু ছোঁবার জো নেই! যুদ্ধের সময় ভাবতুম একবার যুদ্ধটা মিটলে হয়, সকলে বলতোও, আর কিছু

দিন অপেক্ষা কর ভায়া, ভাবনা থাকবে না, সেই ভরসায় থেকে দেখলুম বরং তারপর ঝঞ্ঝাট আরও বাড়লো। অর্ধেক লোক, যারা মনে করুন, এতদিন কাজকর্মে ব্যস্ত ছিল তারা বেকার হ'ল; চতুর্দিকে ধর্মঘট, দাঙ্গা, মারপিট, বোমা তৈরি শুরু ক'রে দিলে আর ফিরতি সৈন্য-সামন্তের দল যে-গুলি শত্রুর চাপে প'ড়ে জুৎসইমাফিক গুলি ছুঁড়তে পারে নি, সে-গুলি আমাদের ওপর দিয়েই পরীক্ষা ক'রে ভিক্টোরিয়া ক্রস্ পাবার ব্যবস্থা ক'রে নিয়ে চ'লে গেল।

মহাযুদ্ধ শেষ হ'ল কিন্তু পৃথিবী শুদ্ধু তারপরেই ঠিক গেল-গেল অবস্থায় এসে দাঁড়াল। এ কি রে বাবা! এ যেন সেই ফোড়া ফাটলো কিন্তু ফুলোটা গেল না গোছের হ'য়ে রইল। পৃথিবীর চারধারে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিন, অক্ষরে অক্ষরে আমার কথার প্রমাণ পাবেন। যুদ্ধের ঝঞ্ঝাটের চেয়ে যুদ্ধোত্তরের ঝঞ্ঝাট বেশি বেড়েছে কিনা বলুন?

যুদ্ধ কি ভাবে এড়ানো যায়, তুনিয়ার অর্থনৈতিক সাম্য কি ভাবে বজায় থাকে, কি ভাবে পৃথিবী শুদ্ধু অসুখী লোককে সুখী করা যায়, কি ভাবে গোমড়া মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলা যায়, তার পরিকল্পনা শুনতে শুনতে তো কানের দফা রফা হ'য়ে গেল। যার সঙ্গেই দেখা হয় সেই দেখি একটা খসড়া নিয়ে ব'সে আছে—ব্যাপার কি? না, যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা হচ্ছে। খবরের কাগজ ওল্টান, যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা, বেতার শুনুন ঐ, ব্যবসাদারদের সঙ্গে কথা ক'ন তাতেও সমান উত্তর—শুনতে শুনতে যতক্ষণ না ধুত্তোর বলছেন ততক্ষণ আপনার নিষ্কৃতি নেই!

আশ্চর্যের ব্যাপারটা হ'চ্ছে এই যে, কে কার কথা শুনছে?

তবু লোকে বলবেই! লোকে যদি বলা ছেড়ে আসলে কিছু ক'রে দেখাতো তাহ'লে তো বাঁচতুম—কল্পনার রাজ্য ছেড়ে বাস্তবে নেমে এলে হয়তো রক্ষা পাওয়া যেত কিন্তু লোকের ব'য়ে যাচ্ছে! যত পরিকল্পনা হবে তত ঝঞ্ঝাট বাড়বে এবং সেজেন্য আমাদের মত গরীব বেচারীদের ভুগতে হবে সব চেয়ে বেশি। আদি কালে মানুষের পরিকল্পনা কম ছিল, তাই ঝঞ্ঝাটও কম ছিল—এখন কল্পনা বেড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে ঝঞ্ঝাটও আসতে আরম্ভ করছে চতুর্দিক থেকে।

ধরুন না কেন, অতি সামান্য একটা ব্যাপার! মানুষ পরিকল্পনা করলে—অতি সহজে এক জায়গা থেকে আর একজায়গায় যাবে, অতএব দ্রুত-যানের আবিষ্কার কর। হ'ল আবিষ্কার, কিন্তু তার ফলে ঝঞ্ঝাট কমলো কি? দ্রুত যাওয়া যাচ্ছে ঠিক, কিন্তু কাছা-কোঁচা সামলে যেতে পারা যাচ্ছে কি? মশাই, অফিসে আসবো যাবো তার ঝঞ্ঝাটের কথা ভেবে দেখুন তো! অর্ধেক পথ থেকে যাঁরা আজকাল ট্রামে বাসে চড়তে পারেন, নামতে পারেন, তাঁরা প্রত্যেকেই আলৌকিক শক্তিসম্পন্ন, এটা স্বীকার করতেই হবে—কারণ আমি কোনদিনই তা পারলুম না—ডিপোয় গিয়ে উঠি আবার সেখানে এসে নামি। একদিন নিজের শক্তি জাহির করতে গিয়েছিলুম কিন্তু তার জন্যে যথেষ্ট লাঞ্ছনা হ'য়ে গিয়েছে। ইন্‌পেক্টর এসে ট্রামের ভাড়া চাইলে কিন্তু আমি পকেটটা খুঁজে পেলুম না—বেমালুম স'রে গিয়েছে—এমন বেমালুম যে, আপনারা দেখলে মনে করবেন যে, দরজী পকেট করতে ভুলে গিয়েছিল বোধ হয়। বুঝুন কি ঝঞ্ঝাট!

যদি মনে করেন যে, বসবার আসনে চেপে বেশ আরাম ক'রে যাবেন তার উপায় নেই, বিশেষ ক'রে উত্তর ক'লকাতার কেটো ট্রামে কিম্বা হাওড়ার—মনে হবে ট্রেঞ্চের ভেতর থেকে শ'খানেক বেয়নেটের খোঁচায় আপনার আর কিছু রইল না।

অনেক সময় ভাবি দাঁড়িয়েই যাই, কিন্তু তাতেও কি ঝঞ্ঝাট কাটে ? তাতে বিপদ বরং বাড়ে। লোকে নিরঙ্কুশ ভাবে পা মাড়িয়ে চ'লে গেল। কাজটা যে গর্হিত হ'ল বা তার জন্যে একটু অপ্রস্তুত ভাব, তা কারুর মুখ দেখে ঠাওরাতে পারবেন না—যেন সকলেরই মনোভাব বেশ করবো—গাড়িতে উঠেছ কেন ? সাত-পাঁচ ভেবে একেবারে এক কোণে গিয়ে দাঁড়ালুম। একটি বাবু—পেছনে ঐ ভীষণ ভীড়েও মনে করুন, সিগারেট মুখে দিয়ে তাঁর বাবুয়ানির খেসারৎ আমার ঘাড় দিয়ে আদায় করলেন অর্থাৎ জামাটি পোড়ালেন।

বললুম, ছি-ছি-ছি, কি করলেন বলুন তো? তিনি সেই অর্ধদগ্ধ সিগারেটটির ছাই একটু ঝেড়ে, বাম হাতের দুই আঙুলে সেটাকে চেপে, একটু মদনবিনিন্দিত হাসি হেসে পোড়া জায়গাটাতে হাত বুলিয়ে ব'লে উঠলেন, 'সরি'! মনে হ'ল লোকটির দুটি গালে একটি ক'রে চড়ের ছাপ দিয়ে দিই—সেও তো আরেক ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার! রোজ তাহ'লে এ সব অর্বাচীনদের আক্কেল দেবার জন্যে আমায় ট্রামে ট্রামে লোকের গালে চড় মেরে বেড়াতে হয় এবং সময় অসময় দুটো খেতেও হয়। আমি নির্ঝঞ্ঝাটের মানুষ, সেও তো এক আপদ হ'য়ে দাঁড়াবে। তাই চেপেই গেলুম।

এর চেয়ে আমাদের আদি অকৃত্রিম গরুর গাড়ি ঢের ভাল ছিল মশাই। তাতে যেতে বিলম্ব হ'ত সত্যি, কিন্তু এত ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হ'ত না। আমাদের মন্থর জীবনধারার সঙ্গে গো-যানের শ্লথ গতি সুবিধের ছিল। আমরা গরুকে বাদ দিয়েছি বহুক্ষেত্র থেকে কিন্তু তার জায়গা দখল ক'রে ফেলেছি আমরা অনেকে। গরুর মোটের চেয়ে বেশি মোট চেপেছে আমাদের মাথায় এবং আমরা তাকে যত হাল্কা করবার চেষ্টা করছি তত ঝঞ্ঝাট চেপে বসছে আমাদের কাঁধে। এসব ফেলে দিয়ে পালাবারও উপায় নেই বরং বিপদ হয়েছে এই যে, নিতান্ত গো-বেচারী হওয়াতে কেউ আমাদের সহজে ছেড়ে দিচ্ছে না, সুযোগ পেলেই শোষ করছে! ভবিষ্যতে মানুষ হ'য়ে উঠলে যদি মুক্তি পাই, সেই আশাতেই এখনও কোন রকমে এত ঝঞ্ঝাট পোয়াচ্ছি—এই আর কি!

চির-কৌমার্যের দুর্ভোগ

চীন দেশে একটা প্রবাদ আছে যে, জগতে এমন কোন লোক নেই যে কোন উপায়ে ঝঞ্ঝাট এড়াতে পারে। পৃথিবীর সমস্ত মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে যদি একধারে ব'সে থাকা যায়, তাহ'লেও দেখবেন ঝঞ্ঝাট ঠিক যথাস্থানে হাজির হবেই। প্রবাদ বচনটি কি তাই শুনুন—

'জানালা কপাট বন্ধ ক'রে
ঘরের মধ্যে থাকো,
তারই ভেতর ঝঞ্ঝাট ঠিক
আসবে লাখো লাখো।'

কথাটা যে হাড়ে হাড়ে সত্যি তা বোধ হয় সকলেই বুঝেছেন। লখীন্দরকে লোহার ঘরের মধ্যে পুরে রেখে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তারই মধ্যে সাপ ঢুকে পড়লো এক ফাঁক দিয়ে, আমাদের কথা তো ছেড়েই দিন। আমাদের তো চতুর্দিকে ফাঁক—বোজাবো কোন্‌টা বলুন ? আমাদের অবস্থা হয়েছে কি জানেন, যেন মারীচের দশা—মরবো ঠিকই, কিন্তু কার হাতে সেটা বলা কঠিন।

সকলে বলছে, দোষ তোমার, অত কুষ্টি মিলিয়ে তিরিশ বছর আগে যখন সংসার পেতেছিলে, তখন খেয়াল ছিল না কি ক'রে সংসার চালাবে ? এখন পরিত্রাহি চেঁচালে কি হবে ? তা তো বুঝতে পারছি, কিন্তু যিনি কুষ্ঠি তৈরী করেছিলেন তিনি

তো গুষ্টিবর্গ সমেত দাঙ্গার সময় লোপাট, হ'য়ে গেছেন, এখন তাঁকে দুটো গাল দিয়ে যে খেদ মেটাবো, তারও তো কোন উপায় দেখছি না। তাহ'লে করি কি বলুন? এখন তো—আর ফেরবার উপায় নেই—বিয়ের ঠেলাটা পুরোমাত্রায় পোয়াতে হচ্ছে, কিন্তু ও-কার্য না করলেও যে খুব সুখ পাওয়া যেত তাও তো মনে হয় না। না-করার জন্যে ঝঞ্ঝাট থাকতো না এও বলতে পারতুম, যদি না এক পরিচিত ভদ্রলোকের গুরুতর অবস্থা চোখে দেখবার সৌভাগ্য হ'ত। তাঁর অবস্থা দেখে তবু একটু সান্ত্বনা পাই।

ভদ্রলোক ঝঞ্ঝাট এড়াবার জন্যেই বিয়ে করেন নি—ভেবেছিলেন কোঁচা দুলিয়ে, সিগ্রেট ফুঁকে, আড্ডা দিয়ে, জীবনটা নির্বিবাদে বেশ কাটিয়ে দেবেন—কিন্তু তাঁর অবস্থা এখন যা হয়েছে তা দেখলে পাষাণ কি বলছেন, বোধ হয় প্ল্যাটিনামও কেঁদে ফেলে!

সকালবেলা উঠে বাজার।—বাড়ির ঝি-চাকর সব বড় বড় চাকরি বাকরি পেয়ে চ'লে গেছে! অতএব তাদের কাজকর্ম এঁকেই সারতে হয়। দুই ভাই বিয়ে করেছে, বছর কয়েকের মধ্যে ডজন দুয়েক বংশধরও আমদানি ক'রে ফেলেছে, কিন্তু চাকরি যোগাড় করতে পারে নি, অতএব এঁদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দাদার। বিধবা পিসির শ্বশুরবাড়ির অবস্থা খারাপ, তিনি আর কোথায় যান, তাঁকে বাধ্য হ'য়েই তাঁর আশ্রয়ে আসতে হয়েছে।

একটি ভাগ্নে, বিদেশে থাকতো, কিন্তু ক'লকাতা ছাড়লে তার পেট খারাপ হয়, তাই সে মামার ওখানেই বছরে ন' মাস কাটিয়ে যায়। একটি মাসতুতো ভাইয়ের অবস্থা খারাপ, তাকে কিছু

সাহায্য না করলে সে বেচারী তো মারা পড়ে। মেজ কাকা দেশে থাকতেন, কিন্তু বুড়ো বয়সে ছেলেপুলে সমেত নেমাজ প্র্যাক্‌টিস্ করতে পারবেন না আশঙ্কা ক'রে ক'লকাতায় এসে ওঁর ওখানেই উঠেছেন, একটা স্থবিধেমত বাড়ি দেখে দিতে পারলেই চ'লে যাবেন।

এর পর আরও আছে, এ তো সবেমাত্র প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য। দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে, মেজকর্তার দুটি ছেলের ইস্কুলে লেখাপড়া ভাল হ'চ্ছে না, তাদের জন্যে একটা মাস্টারের বন্দোবস্ত করার ভার পড়েছে তাঁর ওপর—না পারেন, নিজেকে সময় ক'রে পড়াতে হবে, ছেলেগুলো তো আর বয়ে যেতে পারে না? ভূতির নাকে অবিরত সর্দি ঝরছে, সেটা থামাবার বন্দোবস্ত না করলেই বা চলে কি ক'রে? মেজ বৌমার গরমে আগুন-তাতে অম্বলের ব্যথা বাড়ে, তার জন্যে ডাক্তারের কাছে একবার আপিস থেকে এসে না-যাওয়াটা কি খুব ভাল দেখায়? কয়লা পাঁচ সেরের বেশি একসঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে না, তার বন্দোবস্ত না করলে চলে কি ক'রে?

মান্‌কেটাকে ডাক্তার দু'বেলা তালের মিছরি দিয়ে সরবৎ খেতে ব'লে গেছে, কিন্তু তা খুঁজে-পেতে আনে কে? মেজ-বৌমা বিয়ের বেনারসী প'রে বাসন মাজতে বসেছেন—উপায় কি? বাড়ির লোকের তো আক্কেলের বালাই নেই তিনি কি নিজে দোকান থেকে তাঁর শাড়ী যোগাড় ক'রে আনবেন?—কেন, উনি নির্ঝঞ্ঝাটে মানুষ, ছেলেপুলে নেই, কেউ নেই, এই কাজটা আর এক ফাঁকে সেরে আসতে পারেন না?

আঁবের সময় বাজার থেকে দু'চারটে ভালমন্দ আঁব সবাই ছেলেপুলেদের হাতে কিনে দেয়, কিন্তু সে-সব খেয়াল যদি বাড়ির বুড়ো মিন্সের না থাকে তাহ'লে কি পাড়ার লোকের থাকবে? দুধ যা গয়লা দিচ্ছে তার চেয়ে পিটুলি গুলে খাওয়ানো ভাল ছিল, উনি তো আর গয়লা-বাড়ি যাবেন না তাহ'লে সুব্যবস্থাটা করবে কে?

আজ সাত দিন রান্নাঘরের বাল্‌ব্‌টা কেটে গেছে—কেরোসিন পাওয়া যায় না, উনুনের আঁচের আলোতেই কি রাত্তিরের কাজ-কর্ম রান্না-বান্না সারতে হবে?—দু'বেলা তো খেয়ে যাচ্ছেন, কেন, আপিস থেকে আসবার সময় একটা বাতি কিনে আনলে কি সব পয়সা খরচ হ'য়ে যেত? ভায়েদের সংসার দেখবার ঝঞ্ঝাট তিনি এখন আর পোয়াতে চান না, তাদের বিয়ে দেবার সময় সেটা খেয়াল ছিল না?

কলতলায় এই যে পেছল হয়েছে তা পরিস্কারের তো এতটুকু বালাই নেই, কিন্তু তার জন্যে ভেবলিটা যে মুখ থুব্‌ড়ে সেদিন সেখানে পড়লো তার জন্যে দায়ী কে? পিসিমা পর্যন্ত চম্‌কে ব'লে উঠলেন, আহা, একে তো বাছার নাক নেই, যেটুকু বা ছিল সেটুকুও ধুয়ে গেল গা—বিয়ের সময় কি হবে মা—লোকের দাঁত ভেঙে গেলে আবার দাঁত গজায়, কিন্তু নাক থেঁৎলে গেলে তো আবার নাক ওঠে না?

আসল কথা—বাড়ির কর্তার যে আক্কেল বিবেচনা নেই। সে ক্ষেত্রে কারুর নাক কান চোখ তো আস্তো থাকার কথা নয়—তিনি যে বুঁদ্‌ হ'য়ে আছেন। পাড়ায় রক্ষেকালী পূজোর চাঁদা নিতে

এসে তিন দিন ফিরে গেল, সেখানে গিয়ে যা-দেবার দিয়ে এলেই তো হয়—ধোপার আজ এক মাস টিকি দেখা যাচ্ছে না, ওটাকে বদলে কি আর একটাকে ঠিক করা যায় না ?

বামুন নেই, চাকর নেই, এই গরমে রান্নাঘরে ঢোকা যায় ? এক মাস ধ'রে বলা হচ্ছে যে, একটা বড় তোলা উনুন কিনে আনা হোক, তা উনি পঞ্চাশবার বাজার যাচ্ছেন সে খেয়ালটুকু নেই ?—নিজেকে তো আর কোন ঝঞ্চাট পোয়াতে হয় না—হ'লে বুঝতেন !

অত কথা কি, এক-গাছা ঝাঁটা—তা পর্যন্ত এখনও এল না ? যেটা আছে সেটা তো ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে হাতের তেলোয় এসে ঠেকেছে—এমন সংসারের মাথায় মার ঝাড়ু ! বলা বাহুল্য আমার এই পরিচিত বন্ধুটি সংসারের ঝঞ্চাট এড়াবার জন্যেই বিয়েটা এড়িয়ে গিয়েছিলেন কিনা…

সাহায্য রজনী

দেখুন, আমি কি সাধ ক'রে পরোপকার করতে যাই না? পৃথিবীতে পরোপকার করার চেয়ে ঝঞ্চাট বোধ হয় আর কিছু নেই। নাম তো এতে নেইই—উপরন্তু শুধু শুধু বে-ইজ্জতি হওয়া। আপনি কারুর চাকরি ক'রে দিন, সেখানে যা-কিছু অসুবিধে হবে তার জন্যে গাল খাবেন আপনি। নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়ান, পরের পয়সায় মোষের খোরাক্ মেরে বাড়ি গিয়ে নিমন্ত্রিত ব্যক্তি চোঁয়া ঢেঁকুর তুলতে তুলতে যদি না আপনাকে গাল পাড়েন তো কি বলেছি। আপনি কারুকে সাহায্যের জন্যে ক্ষমতা মত কিছু দান করুন, ঠিক আড়ালে শুনবেন—বেটা চামার!—এর বেশি এক আধলা ওর হাত দিয়ে গলবে? আপনি খুঁজে-পেতে কাউকে কোন জিনিস কিনে এনে দিন, সেটা ব্যবহার করতে করতে এতটুকু খুঁত বেরুলেই বলবে আপনি ঠকিয়েছেন, আপনি লোককে সাহায্যের জন্যে ব্যবস্থা করুন, দেখবেন, পৃথিবীতে আপনার চেয়ে অসহায় আর কেউ নেই!

মশাই, মাস কতক আগে দেশের ইস্কুলের জন্যে একটা-কিছু সাহায্যের বন্দোবস্ত করবার ভার পড়লো আমার ওপর—বেশ ভাল কথা। সব বন্দোবস্ত করলুম, তার জন্যে অনেক কিছু খেসারৎ দিলুম, মাঝখান থেকে বদনাম হ'ল, আমি দু'হাত্তা টাকা মেরে ব'সে আছি।

পাড়ায় একটা থিয়েটারের ক্লাব আছে। তাঁদের কাছে গিয়ে ইস্কুলের জন্য একটা সাহায্য রজনীর কথা বলতেই তাঁরা সমস্বরে ব'লে উঠলেন, বেশ তো, এর আর হাঙ্গামা কি? আমরা অভিনয় ক'রে টাকা তুলে দেব। মানে, এক কথায় সবাই রাজী—আমার আহ্লাদ ধরে না, কিন্তু কে জানত মশাই, এ দেশে নাটক অভিনয় করার এত বায়নাক্কা!

লোকে টিকিট কেটে অভিনয় দেখতে সাধারণত চায়না জানি, কিন্তু লোকে যে চ্যারিটি শোতেও পাস চায়, এই আশ্চর্য! সৌখিন নাটক অভিনয়ের যদি এই অবস্থা হয়, তাহ'লে পেশাদারী নাট্যালয়-গুলির অবস্থা যে কি তা তো ভাবতেও হৃদ্‌কম্প লাগে। উঃ! দেড়টা মাস আমাকে একেবারে পাগল ক'রে ছেড়েছে!

সভ্যদের মত হ'ল সাজাহান করতে হবে, কিন্তু এখন আর গোঁপ-দাড়ি-কামানো ছেলেদের দিয়ে মেয়েছেলের পার্ট করানো নাকি চলে না—অতএব কতকগুলি মেয়ে জোগাড় কর। মেয়ে আমি কোত্থেকে যোগাড় করি বলুন তো? ট্রামে বাসে ধরবো?—তাহ'লেই তো দফা রফা!

শেষে দুটি ছোকরাকে নিয়ে বেরোনো গেল, কিন্তু মেয়ে কোথায়? একি ঘটকালি করতে বেরিয়েছি, না, স্ত্রী-স্বাধীনতা আন্দোলনে বেরিয়েছি যে, প্রত্যেক বাড়ি থেকে গোটা পঁচিশ ক'রে মেয়ে বেরিয়ে আসবে? তাছাড়া আগে মনে করুন, যে-সব জায়গায় থিয়েটার-বায়োস্কোপের মেয়ে পাওয়া যেত এখন সেই সব জায়গায় রাঁধাবাড়া ঘরকন্না শুরু হ'য়ে গেছে, যাদের চরিত্রের একটু দোষ গুণ ছিল ব'লে শুনতুম তারা পর্যন্ত দেখলুম ওটা

পুলিসের জিম্মায় রেখে হনিমুন করতে বেরিয়ে গেছে—শুধু কম্মের ভোগ আর নাকাল—পাহারাওয়ালায় ধরলে, কিছু গচ্ছা গেল, একদিন এক বাড়িতে গিয়ে মার খেতে খেতে বেঁচে গেলুম—সেও এক হুজ্জুতির ব্যাপার! পাড়া শুদ্ধু লোকের কাছে সে কী লাঞ্ছনা!

তার ওপর দুটো আহাম্মক রয়েছে সঙ্গে, তারা আবার লোককে বোঝাতে চায় যে আমাদের দোষ নেই মশাই, আমরা কোন কু-মতলব নিয়ে এখানে আসি নি—থিয়েটারের মেয়ে যোগাড় করতে এসেছি!

কি বল্লি? থিয়েটারের মেয়ে?—এই মারে তো এই মারে, শেষে অনেক ক'রে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে বলি যে, না মশাই, আমাদের এক মেশোমশায়ের বাড়ির মেয়েদের থিয়েটার দেখতে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু তাদের বাড়ি খুঁজে পাচ্ছি না—এই ব'লে রেহাই পাই। কোনক্রমে প্রাণ বাঁচিয়ে চলে এসে প্রতিজ্ঞা করলুম—না, এ-কাজে বাবা আমি নেই।

ক্লাবে বললুম, মাপ্ কোরো দাদা, মেয়ে নিয়ে আসা আমাদের সাধ্যের বাইরে, অন্ততঃ আমার তো বটেই! ও-সব কায়দা-টায়দা যাদের জানা আছে, এর আগে দু'পাঁচটা মেয়েছেলেকে টেনে নিয়ে এসেছে তাদের বল। তা না হ'লে থিয়েটার বন্ধ থাক্।

একজন মহোৎসাহে ব'লে উঠলেন, আরে, কটা মেয়ে তো—কালই আমি হাজির করবো। কী, আশ্চর্য! হাজির করলেও! কিন্তু তাদের দেখে তো আমার চক্ষু স্থির। প্লে হবে সাজাহান। যিনি জাহানারা সাজবেন তাঁর চেহারা রোগা প্যাঁকাটির মত উপরন্তু আপনাদের বিধাতা তার নাকটিকে যেমনি থ্যাবড়া ক'রে

বসিয়েছেন তেমনি পুষিয়ে দিয়েছেন দুটি দাঁতকে উঁচু ক'রে তুলে। আমার মনে হ'ল একে দেখেই তো লোকে টিকিটের দাম ফেরত চাইবে। তাঁরই বোন মহামায়া, আকৃতি অনুরূপ—বরং বাড়তির ভাগ কোন্ দিকে ঠিক চাইছেন বোঝবার উপায় নেই।



তারপর পিয়ারা—উঃ! খানদানি ঘরের চেহারা বটে! এই রেশনের বাজারে গর্ভনমেণ্ট এঁকে কি চাল খাওয়ান তা তাঁরাই জানেন, তবে এই রকম আর গোটা-কতক উঁকি মারলে—আমাদের বোধ হয় খাওয়া জুটবে না, কারণ কিছু বাকী থাকলে তবে তো আমরা খাব?

তারপর আবার ভূমিকা বণ্টনের সময় কুরুক্ষেত্র কাণ্ড। ছ'জন সাজাহান, এক ডজন ঔরঙ্গজেব, একশোজন যশোবন্ত সিংহ এসে হাজির। প্রত্যেকে অন্ততঃ দেড়শো বারোয়ারীতে পালা গেয়ে এসেছে। কিন্তু যাদের জোরে অত বড় মোগল সাম্রাজ্য—তাদের টিকি দেখতে পাওয়া গেল না—অর্থাৎ সৈন্য নেই!

রোজই সবাই বলে, কুছুপরোয়া নেই, ও হ'য়ে যাবে, তুমি ভেতর থেকে 'হ্যালা ল্যালালা হো' ক'রে মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে যেও না, বাকীটা আমরা সামলে নোব। আমি তো মশাই, অভিনয়ের দিনে ভেতর থেকে প্রাণপণে প্রত্যেক দৃশ্যে মনে করুন, হ্যালা ল্যালা করতে শুরু করলুম, কেবল ভয়, পাছে নাটকটা কোথাও ঝুলে যায়, কিন্তু ফল হ'ল ঠিক উল্টো। ঔরংজেব এসে

হঠাৎ চক্ষু রক্তবর্ণ ক'রে আমায় বলে উঠলেন, ওকি হ'চ্ছে কি? আপনি দয়া ক'রে বেরিয়ে যাবেন কি স্টেজ থেকে? যেখানে সেখানে দাঁত বার ক'রে হ্যালা ল্যালা করলেই হ'ল বুঝি? এমন আহাম্মক তো আমি কখনো দেখি নি।

কাঁচুমাচু হয়ে বললুম, আজ্ঞে নাটকটা পাছে ঝুলে যায় তাই—

তিনি আমায় খিঁচিয়ে ব'লে উঠলেন, তাই আপনি ভেতর থেকে ঐ রকম ক'রে নাটককে তুলে ধরছেন, আর আমার সব ভাল ভাল জায়গাগুলোতেও দর্শকরা পর্যন্ত ঐ রকম হুলো-বেড়ালের মত ডাক শুরু ক'রে দিয়েছে—হুঁঃ, রাবিশ! যান, আপনি বাইরে গিয়ে টিকিট দেখুন গে।

অগত্যা বেরিয়ে এলুম। অভিনয় দেখেছি কিন্তু এর কাণ্ড-কারখানার সঙ্গে তো পরিচয় নেই তাই হয়তো অনভ্যাসের ফলে কিছু গোলমাল হ'তে পারে, তাই মুখ বুজে ত্রুটি স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

যাই হোক, বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি সবে, এমন সময় শুনি লোকে যশোবন্ত সিংহকে এন্‌কোর দিতে শুরু করেছে। সে কী কাণ্ড! আপিসের জন কয়েককে চ্যারিটির টিকিট বিক্রি করেছিলুম, তাঁরা দেখি দ্বিতীয় অঙ্কের পর ক্ষেপে বেরিয়ে যাচ্ছেন, উপরন্তু যাবার সময় শাসিয়ে গেলেন, টিকিটের দাম দেব'খন ভাল ক'রে —এই সব দেখিয়ে পয়সা আদায় করবে, ইয়াকি?

ঠিক তারপরই পিয়ারার গান, সেই সময় পেছন থেকে আমার মাথা খেতে কোন এক বজ্জাত ছোকরা ব'লে উঠেছে, 'বলিহারী, তাকিয়া বাইজী!'

আর যায় কোথা? পিয়ারা একেবারে অন্যরকম চেহারা ক'রে স্টেজের ভেতর চ'লে গেলেন। অভিনেতা অভিনেত্রীদের ধারণা হ'ল স্টেজ থেকে বিতাড়িত হ'য়ে দর্শকদের আসনে ব'সে আমি লোকদের তাতাচ্ছি। আচ্ছা, একী আপদ বলুন তো?

এটা বুঝিস না, আজ আমারই দায়। সমস্ত ঝক্কি ঘাড়ে নিয়ে, পয়সা কড়ির আগাম ছেরাদ্দ ক'রে আমি এখন বাইরে গিয়ে লোককে ফুট কাটতে শেখাবো? আজকালকার ছেলেদের কোন কিছু ভাল না লাগলে তোরা তো তোরা—তারা নিজেদের বাপ দাদাকে টিপ্পনী কেটে বসিয়ে দেয়, তাদের বলে শেখাবো আমি?

তাছাড়া তোদের জন্যে কি না করেছি, পঞ্চাশ, যাট, সত্তর, মেয়েগুলো যে যা চেয়েছে দিয়েছি, এক মাস ধ'রে তোদের খিদ্‌মদ্‌গারি করেছি, আপিস থেকে কে টিফিন খেতে ভুলে গিয়েছে, রিহার্শেলের সময় তার টিফিন যুগিয়েছি, কার তিন দিন ধ'রে পেট ভুট্‌ভাট্‌ করছে তাকে কচি ডাব ছুলে পেট ঠাণ্ডা করিয়েছি, কার চুরুট না হ'লে ভাব আসে না তাই এনে দিয়েছি, তাছাড়া ভিক্টোরিয়া প্রপাতের মত চায়ের প্রপাতে সবাইকে চুবিয়েছি, পিয়ারার মা মেয়েকে সামলাতে রোজ রিহার্শেলে আসতেন, তিনি গরম পেঁজবড়া খেতে ভালবাসেন তাঁর জন্যে ঠাকুরের দোকান থেকে সদ্য ভাজিয়ে ঠোঙা ঠোঙা বড়া কোঁচার খুঁটে ঢেকে এনে দিয়েছি। কে রিক্সায় আসবেন, ট্যাক্সিতে যাবেন, তার ভাড়া যুগিয়েছি, অত কথা কি, অভিনয়ের রাত্তিরে সুজার দাড়ির চুল কম পড়াতে সে রেগে স্টেজ থেকে বেরিয়ে চ'লে যায়

দেখে নাপতে ডেকে নিজের মাথা মুড়িয়ে তার দাড়িতে চুল এঁটে দিয়েছি—তবু দেখুন দেখি, এ কি ফ্যাঁসাদ!

তখন সে কথা কে বোঝে? পিয়ারা তো আমাকে যাচ্ছে-তাই ক'রে গালাগালি দিলে, তার চেয়ে বেশি দিলে তার মা। কী চীৎকার! কেবল বলে, তুই পোষাক খুলে ফেল ভুঁদী—এ ছোট লোকের জায়গা।

পোষাক খুলবে মানে?—আমার তো প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হ'ল! শেষকালে কি একটা কেলেঙ্কারী ব্যাপার হবে না কি? কিন্তু বরাত ভাল, বিবি পোষাক প'রেই তিনটি তক্তা জুড়ে গ্যাঁট হ'য়ে ব'সে রইলেন আর চীৎকার ক'রে বলতে শুরু করলেন, কভি নেহি বাহার হোগা, আমাকে এরা ভেবেছে কি—আমার জন্যে কত লোক পাগল হ'য়ে ঘুরছে তা উনি জানেন?

আমি বললুম, সে তো আমার দিকে চাইলেই বুঝতে পারবেন ঠাক্‌রুণ। আদ্দেক হ'য়ে উঠেছি, এবার আপনি সিনে না-বেরুলে পুরোপুরি ক্ষেপে হয়তো আপনাকেই কামড়ে দোব।



ও মাগো, ব'লে কি?—বলেই গ্লোব ঠাক্‌রুণ দিলেন এক লাফ। আর যায় কোথা? গিরিশবাবুর আমলের পর থেকে তো আর স্টেজের পুরোণো তক্তা বদলানো হয় নি—তিনি সজোরে লাফ দিতেই মচাৎ ক'রে গেল তা ভেঙে, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রেয়সীর

প্রতীক্ষারত সুজাকে নিয়ে একেবারে করলেন পাতাল প্রবেশ। আচম্‌কা যাদুবিদ্যাবলে দুটি মূর্তি দর্শকদের চোখের সামনে থেকে উবে যেতেই কী চড়্-চড়্ ক'রে হাততালি! সকলেই বলাবলি শুরু করলে, হ্যাঁ, এইখানে এরা একটা প্যাঁচ দেখিয়েছে বটে, কিন্তু ওদিকে যে সব ফ্যাঁচ হ'য়ে গেছে সেটার খবর আর কেউ দেখে নি।

সুজা বেচারী পড়েছিল পিয়ায়ার নীচে অতএব তার প্রেয়সীর কিছুই হ'ল না শুধু নিজের মাজাটা গেল ভেঙে আর আমায় সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে হ'ল থানায় আর হাসপাতালে।

প্লে মাথায় উঠে গেল, অর্ধেক দর্শক টিকিটের দাম তো কোনদিন ঠেকালেনই না, উপরন্তু থিয়েটারের কতকগুলি চেয়ারের ওপর হনুমানের মত নেচে তার দফা নিকেশ ক'রে হাসতে হাসতে বেশ আনন্দ ক'রে বেরিয়ে গেলেন।

এর পর আরও যা-সব হ'ল সে আর ব'লে কাজ কি। সে যে কী ঝঞ্চাট গেছে, তা যাঁরা এ কাজ করেন তাঁরা খানিকটা বুঝবেন।

নিজের ট্যাঁক থেকে সর্বসাকুল্যে তিন শো পঁচাত্তর টাকা সাহায্য রজনী ক'রে, পরোপকারের সেলামী দিয়ে এলুম—ইস্কুলের মাস্টার মশাইরা বললেন যে, তাঁদের নাম নিয়ে আমি হাজার

দুয়েক টাকা অন্ততঃ পকেটে পুরেছি। এদিকে সুজার চুল বাবদ মাথাটি নেড়া ক'রে আপিস থেকে অর্ধেক মাইনেতে ছুটি নিয়ে পুরো একটি মাস ব'সে রইলুম আর মাঝে মাঝে গিন্নীর বচন শুনতে লাগলুম, বেশ হয়েছে—একটা উল্টো গাধায় চাপিয়ে তোমায় যে কেন ছেড়ে দিলে না, এইটেই আমার আপ্‌শোষ র'য়ে গেল।

হায় রে বরাত !—এই পরোপকার করতে যাওয়ার ঝঞ্ঝাট !

শিক্ষার সেলামী

জানেন দুর্ভোগ? এবার ঘণ্টে আর খ্যাঁদাকে পাস করিয়ে আনতে হ'ল, দুটিতে একসঙ্গেই গাড্ডু দিয়েছিল কিনা! সব নম্বর পেয়েছেন কি রকম শুনবেন?

অঙ্কয় ১৭, ইংরেজীতে ২৩, বাংলায় ১৯, ইতিহাসে ৭, ভূগোলে—পৃথিবী গোল।

আমি জানি, এ নিয়ে খিঁচুলে দোষ হবে আমার, এখুনি বাড়িতে সবাই ব'লে উঠবেন, নিজে একটু ওদের দেখাশুনা করতে পার না? ইত্যাদি।

অর্থাৎ চাকরি করা, বাজার করা, রেশনে কাপড়-চোপড় আনা, ডাক্তারের বন্দোবস্ত করা থেকে আরম্ভ ক'রে ছেলেমেয়েদের পাস করানোর ভারটাও আমার। কি ঝঞ্ঝাট বলুন তো? বোধ হয় ইস্কুলে আপত্তি না করলে আমাকে এগজামিনটাও দিয়ে আসলে ভাল হ'ত, কারণ ছেলেপুলেদের পড়ার টাইম কখন?

তারা মিটিং করবে, পিকেটিং করবে, শনি-রবিবারে সিনেমায় যাবে, ফুটবল-ম্যাচ দেখবে, ক্রিকেটের ফলাফলের জন্য খাওয়া-দাওয়া ত্যাগ করবে, বারোয়ারীর চাঁদা তুলবে, সভায় গিয়ে মারপিট করবে, তাদের সময়টা কখন?

কিন্তু আমি যে গেলুম!

যদি বলি, ওরে বাবা, ওসব কর আপত্তি নেই, কিন্তু একটু তার সঙ্গে লেখাপড়াটাও কর।

তার উত্তর সব মুখে যোগানো, বলে, লেখাপড়া শিখেই জাতটা উচ্ছন্ন গেছে, এখন তাই ওসব না করাই ভাল।

অতএব চতুষ্পাঠি খালি। খালি চুপাটি চটি প'রে বাবুরা বিকেল নাগাদ বেরিয়ে পড়লেন, ন'টার আগে কারুর টিকি দেখার জো নেই। বেশি কিছু বললে, ফট ক'রে মুখের ওপর ব'লে দিলে, 'জয় হিন্দ!' প্রাণ যায় আর কি!

ভেবেছিলুম মরুকগে, এ বছরটা ওই ক্লাসেই থাকুক। তা কি হবার জো আছে?

গিন্নীর তাগাদা, তুমি একটু ইস্কুলে ব'লে এস, ওদের যেন উঠিয়ে দেয়। শুধু শুধু এক বছর নষ্ট হবে?

আমি বললুম, হোক্‌গে, আমি ও রকম নির্লজ্জের মত কাউকে বলতে পারবো না। তা ছাড়া ক্লাসে উঠিয়ে দিলে হবে কি, উঁচু ক্লাসে কিচ্ছু—একবর্ণও পারবে না।

অমনি তর্ক।—ঠিক পারবে। একটু পড়লেই ওরা সব পারে, ওদের ক্লাসেই তো কত ছেলে বাড়ি থেকে চিঠি নিয়ে এসে ক্লাসে উঠে গেল।

কি সর্বনাশ! চিঠি নিয়ে নিয়ে আজকাল ছেলেপুলেরা পাস করছে নাকি?

শুনলুম, ও-স্কুলে তা করে। তা না হ'লে পাছে ছেলেরা ইস্কুল ছেড়ে দেয়, তাই মাস্টার মশাইরা ভয়ে ভয়ে ছেলেদের গার্জেনদের

চিঠি পেলেই পাস করিয়ে দেন। ভাবলুম, দেখ, পোড়া পেট কি রকম, মাস্টারিতেও ঝঞ্ঝাট বাধিয়েছে!

যাক, তবু হেডমাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলুম। তিনি গুঁইগুঁই ক'রে বললেন, আপনি বলেন তো উঠিয়ে দিই, তবে ভেবে দেখুন, কতদূর কি হবে!

আমি বললুম, দূর আর বেশি নেই, বুঝতে পারছি; তবে আপনারা যতদূর পারেন ঠেলে দিন, তারপর গড়াতে গড়াতে যেখানে গিয়ে ঠেকে।

তিনি হেসে বললেন, দেখুন, আমরা তো যতদূর পারি করি, তবে বাড়িতে আপনাদেরও তো কর্তব্য আছে! সেখানে একটু পড়াশোনা যদি আপনারা নিজেরা না দেখেন, তাহ'লে কি ক'রে কি হয়?

বুঝুন। ইস্কুলে মাইনে দোব, পাংখা ফি দোব, স্পোর্টিং ফি দোব, তা ছাড়া লাইব্রেরী ফি, চড়াইভাতি ফি, মা সরস্বতী পূজো ফি—সব দিয়েও কর্তব্য শেষ হ'ল না, আবার বাড়িতে তাদের নিয়ে উঠে প'ড়ে লাগো! যাঁদের পড়ানোর কথা, তাঁরা পড়াবেন না, পড়াব আমি, তাঁরা শুধু রোজ পড়া দেবেন আর পড়া নেবেন! এতে তারা পাস করতে পারে ভাল, না পারলে ব'য়ে গেল। তুমি হাঁসফাঁস করতে করতে ইস্কুলে ছুটে এসে, আর বুড়ো বয়সে হেডমাস্টার মশাইয়ের পিছু পিছু, যেন তোমার নিজেরই প্রমোশান আটকে গেছে, এইভাবে আবেদন-নিবেদন জানিয়ে ঘোর।

আপনারা হয়তো আমাকেই দোষ দেবেন, সেটা আমি জানি।

এক্ষুনি বলবেন, তুমি একটা মাস্টার রাখ নি কেন? মানে—মাস্টার রাখলেই পাস হবে আর শিখবে!

তাহ'লে ইস্কুলে যারা বিদ্যের ভার নিয়েছেন, তাঁরা করবেন কি?

তারপর মাস্টার পাই কোথা? পনেরো টাকায় দু বেলা সাতজনকে অঙ্ক, বাংলা, ইংরিজী, সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, ব্যাকরণ, বিজ্ঞান, ইংরিজী গ্রামার, ট্রানস্লেশন, রচনা—সব তিনি করিয়ে দেবেন?

হাতে থাকে তো দেবেন একটা পাঠিয়ে।

মশাই, এতগুলো বই, ওদের বাবা হয়ে আমি একবার ক'রে প'ড়ে ঠিক ক'রে নিতে পারলুম না, আর ওদের একজন মাস্টার এলেই পারবে? সব কটাকে পড়াবার ঠিক বন্দোবস্তা করতে গেলে তো বাড়িতে আর একটা ইস্কুল খুলতে হয়। সেও তো আর এক ঝঞ্ঝাট!

তারপর মনে করুন, ইস্কুলে পড়াবে সব বাংলায়, কিন্তু প্রশ্ন করবে সব ইংরিজীতে। এ আবার কোন্ দিশী কথা? তার ওপর ইস্কুলে যা ইংরেজী শেখে সে তো আমার চেয়ে খারাপ। আমি তবু সায়েব সুবো গালাগালটা দিলে বুঝতে পারি, কিন্তু ওরা বোধ হয় তাও পারবে না।

এর ওপর শুনছি আবার হিন্দুস্থানী ভাষা শিখতে হবে! কারণ ওইটেই পরে চলবে। দেখলুম, ছেলেমেয়ে তাতে উঠে প'ড়ে লেগেছে, পকেটে এক আধলা থাকবার জো নেই, প্রত্যেক শনি-রবিবারে একখানা ক'রে হিন্দী ছবি দেখে আসা চাই। বাধা দোব কি? রাষ্ট্রভাষা শিখতেই হবে।

তাও পড়াশোনা ক'রে নয়, ওই হিন্দী ছবি দেখে দেখে।

মানে, যা দেখলুম, বর্তমানে ছেলেপুলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা এক গুরুতর ঝঞ্ঝাট।

বই তো কিনে উঠতে পারি না, ওরাও প'ড়ে উঠতে পারে না, তারপর যদিও বা বেশি ক'রে পড়ে. তাহ'লেও আবার ভয় হয়, এই বুঝি যক্ষ্মা-হাসপাতালে পাঠাতে হ'ল!

আপনারা বলবেন, বেশি পড়লেই বুঝি তাই হয়? আমার তো মনে হয়, না খেয়ে বেশি পড়াশোনা করতে থাকলে হয় মানুষ বেভ্যুল বকতে থাকে, নয় ধুঁকে মরে।

অতএব ছেলেপুলেদের 'বেশি পড়াশোনা কর' বলতেও ভরসা হয় না।

তাদের পড়ার ঝঞ্ঝাটটা না হয় কোনমতে সামলাতে পারি, কিন্তু এ-বাজারে তাদের বেশি খাওয়ার ঝঞ্ঝাট তো সামলে উঠতে পারব না দাদা।

ইনি

আমার ঝঞ্ঝাটের মধ্যে আদিও নেই শেষও নেই। কেন? তা দু'চারদিন অধীনের সঙ্গে ঘুরলেই বুঝতে পারবেন। একেবারে পাগল হ'য়ে গেলুম! আপনাদের সঙ্গে এঁর আলাপ আছে কিনা জানি না, মশাই আমার সঙ্গে আছে, যেহেতু আমার সঙ্গে এঁর এক সময় পরিচয় ছিল। এ যুগে পরিচয় থাকাটা যে এত ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার, এ যদি আগে জানতুম মশাই, তাহ'লে কোন্ ইয়ে মনে করুন, আলাপ করতে যেত।

এঁর জ্বালায় রাস্তায় চলবার উপায় নেই, বাড়িতে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকবার জো নেই, ট্রামে ওঠবার উপায় নেই, কারণ ইনি কখন কোথা থেকে কি ভাবে যে আলাপ জমাবেন তার কোন তাল আজ পর্যন্ত খুঁজে পাই নি। ইনি যদি ট্রাম বা বাসের সামনের সিটে বসেন এবং আমি শেষ প্রান্তে মুখ ঘুরিয়ে ব'সে থাকি, তাহ'লেও তিনি স্বস্থান থেকে ঘাড় ফিরিয়ে ঠিক আমাকে খুঁজে বার ক'রে নাম ধ'রে ডেকে চীৎকার শুরু করবেন।—কি খবর? কোথায় যাচ্ছেন? অমুক জায়গায় নাকি? অমুক যে আপনাকে কাগজে খুব এক হাত নিচ্ছে, বেটার গায়ের জ্বালা খুব বেশি, না? আপনি সেই জায়গায় এখন চাকরি করছেন তো? সবসুদ্ধ, ছেলেপুলে কটি হ'ল? ইস্কুলে দিয়েছেন? মেয়েটির বিয়ের কিছু করলেন নাকি? আপনার আপিসের ইন্‌ক্রিমেণ্ট্ নিয়ে যে বেটা

সাহেব গোলমাল করেছিল, সেটা এখনও আছে নাকি? ইত্যাদি ইত্যাদি।

সমস্ত আরোহীদের দৃষ্টি আমার দিকে। আমি এবং আমার পরিচিত ইনি যে কেউকেটা ব্যক্তি নয়, সেটা তিনি খুব ভাল ভাবে সকলকে জানিয়ে এতখানি বাহাদুরি করতে লাগলেন যাতে মনে হ'ল যে, এর পরের স্টপেজে নেমে পড়ি গাড়ি থেকে। দেখলুম, যথেষ্ট পরিমাণে অন্যমনস্কভাবে জবাব দিলেও এবং ততোধিক তাচ্ছিল্য দেখালেও এঁর কাছ থেকে ছাড়ান পাবার উপায় নেই, কারণ তিনি নির্বিকার। বাধ্য হয়ে পথিমধ্যে নেমে পড়তে হ'ল।

কিন্তু নিস্তার পাবার জো নেই, নেমন্তন্ন রাখতে গিয়েছি, সেখানে হঠাৎ এঁর সঙ্গে আমার দেখা, আর রক্ষে আছে? পরিচিত অপরিচিত সকলের সঙ্গে ইনি আমার আলাপ করিয়ে দেবেনই। এঁর পরিচয়ের ঠেলায় বাধ্য হয়ে আজকে শরীরটা খারাপ ব'লে হয় নেমন্তন্ন-বাড়ি থেকে চ'লে আসতে হয়, নয় পাতে ব'সে পড়লে বেগুন ভাজা খেতে খেতে গলায় বিষম লাগে।

এঁর ধারণা, আমি ইচ্ছে করলে প্রায়ই এঁকে দশ-পনেরো টাকা ধার দিয়ে আর কখনও না চাইতে পারি। এঁর যাবতীয় পরিচিতদের ইচ্ছে করলেই উপকার করা বা চাকরি যোগাড় ক'রে দেওয়া আমার পক্ষে নিতান্ত সহজ। ইনি যত্রতত্র আমার সঙ্গে যে কোন অবস্থায় রসিকতা করতে পারেন, এঁর কাছে আমার সময়ের মূল্য নেই, এঁর যখন খুশি তখনই এঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হ'তে পারে, এঁর কাছে কোন কিছু করার অক্ষমতা বোঝাতে যাওয়া 'এড়ানোর নামান্তর,' সাহায্য না করতে পারা 'পেজোমি', টাকা

ধার না দেওয়া 'চালাকি,' এবং সময়ের অভাব জানানো 'চালিয়াতি'।

এঁর সঙ্গে সুখ-দুঃখের কোন সম্বন্ধ আমার কোন কালে নেই, শুধু মাত্র মৌখিক আলাপ, তাও 'কোন্ দূর শতাব্দীর কোন্ এক অখ্যাত দিবসে।' মাঝে মাঝে এঁর দেখা পাই মাত্র এঁরই নিজের প্রয়োজনে, 'চিরদিন যে পাই না' তা আমার স্বর্গগত পিতৃপুরুষদের বহু পুণ্যফলে! এঁর হাত থেকে মুক্তি পাই যে কি রকমে, তা আজও ঠিক ক'রে উঠতে পারি না। বিধাতা আমার বরাতে এই অনাবশ্যক ঝঞ্ঝাটটিকে জুটিয়ে দিলেন যে কোন্ পাপে, তা তিনিই জানেন।

ইনি যা করবেন আমাকে তা সমর্থন করতে হবে, এঁর আবদার অসম্ভব হ'লেও আমাকে তা মেটাতে হবে, এঁর মেয়ে গান কেমন শিখেছে তা শোনবার জন্যে দু' ঘণ্টা ঠায় ব'সে যমযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, এঁর ছেলের প্রতিভা ভবিষ্যতে বাংলা দেশ সামলাতে পারবে কি না তাই নিয়ে গবেষণা করতে হবে, ইনি যা লিখবেন এবং যেখানে সেখানে যখন তখন পড়তে আরম্ভ করলে তা আমার ধৈর্য ধ'রে শুনতে হবে এবং অত্যন্ত খুশি হয়ে ভাল বলতে হবে, ইনি আমায় যেখানে নিয়ে যাবেন সেইখানে আমায় ঠিক সেই সময় যেতে হবে। ইনি সিগারেট খেলে সেটা যোগাবার ভার আমার, এক সঙ্গে উভয়েই রেস্তোরাঁয় ঢুকলে তার সমস্ত বিল পরিশোধ করার ভার দেবেন ইনি আমাকে, ট্রামে এক সঙ্গে উঠলে দুজনের টিকিট কেনবার দায়িত্ব থাকবে আমার ওপর, ইনি ভুলেও নিজের ব্যাগ বার করবেন না।

আমি যা পৃথিবীতে সুবিধে পাব তার অংশ দিতে হবে আমাকে, ইনি আমার এমন সুখ্যাতি করবেন যার জন্যে আমাকে লজ্জিত হ'তে হবে সকলের কাছে এবং টিটকিরি সহ্য করতে হবে একশো লোকের। আমার কে কে শ্রাদ্ধ করেছে এবং কে কি আমার বিরুদ্ধে বলেছে তা সমস্ত তিনি চুপটি ক'রে শুনে এসে আমার গোচরীভূত করবেন সকলের আগে। আমি বিন্দু মাত্র এঁর মনোমত কোন কার্য না করতে পারলে ইনি আমার আড়ালে আমার সম্বন্ধে খুব ভাল ভাল উক্তি ক'রে বেড়াবেন।

এঁর বাড়ির ট্যাঙ্কে গঙ্গাজল আসছে না কেন তার জন্যে আমাকে ছুটতে হবে কর্পোরেশনের কর্তাদের কাছে, পাড়ার লোকের সঙ্গে দাঙ্গা করলে আমায় যেতে হবে থানায়, ইনি নাটক লিখলে সেই নাটকের অভিনয় করিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে আমাকে, ফুটবল খেলার চ্যারিটি ম্যাচের টিকিট না পেলে তার প্রাপ্তির বন্দোবস্ত ক'রে দিতে হবে আমাকে, এবং এই সমস্ত দাবি না মেটাতে পারলে ইনি আমার শ্রাদ্ধ করবেন সর্বাগ্রে। অথচ আশ্চর্য, ইনি আমার কোন উপকার করতে কোন দিন এগিয়ে আসবেন না এবং সামর্থ্য থাকলেও আমার কোন কার্য ঘাড়ে নেবার পূর্বেই বা পরেই ইনি অসুস্থ হতে শুরু করবেন। এঁকে নিয়ে আমি করি কি ?

আপনাদের কারুর সঙ্গে কি এঁর পরিচয় নেই ?—থাকলে বুঝতেন পৃথিবীতে ঝঞ্ঝাট কাকে বলে।

বিরূপাক্ষের রচনা সম্বন্ধে অভিমত

ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে শ্রীবিরূপাক্ষ মহাশয় একটি সম্পূর্ণরূপে নূতন জিনিস আনিয়া দিয়াছেন। এই জন্য তাঁহার আসন বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে, সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নাই। অখ্যাত অবজ্ঞাত নীরব ভারবাহী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছা-পোষা ভদ্রসন্তানকে মুখপাত্র করিয়া তিনি আমাদের চলিষ্ণু সমাজের যে চলচ্চিত্র তাঁহার হাস্যরসোজ্জ্বল দৃষ্টির সাহায্যে উদ্ভাসিত করিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন তাহা সত্য, সরস, অকপট এবং অনসূয়, এবং এই হেতু তাহাতে ঋতম্ভরত্ব আছে, তাহা শাশ্বত হইয়া থাকিবার বস্তু।

বহুদিন পূর্বে কলিকাতা শহর জুড়িয়া কোনও নাটকের বিজ্ঞাপনরূপে প্রাচীর গাত্রে একখানি ব্যঙ্গচিত্র প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার কথা মনে হইতেছে। কেরোসিন তেলের বাক্সের কাঠে তৈয়ারী একখানি পঙ্গু ভিক্ষুকদের উপযোগী ছোট টানা গাড়ি, তাহাতে ঠাসাঠাসি করিয়া বসিয়া আছে অবনতমুখী অরক্ষণীয়া কন্যা, সিগারেটের ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছাড়িতেছে এমন ঊর্ধ্ব মুখ বয়াটে পুত্র, আকাশের দিকে দুই হাত তুলিয়া প্রায় নিরাভরণা পত্নী, সম্ভবতঃ স্বামীকে গঞ্জনা দিতেছেন, না হয় পোড়াকপাল বিধির নিন্দা করিতেছেন, উপরন্তু কতকগুলি অপোগণ্ড শিশুও গাড়িখানিতে রহিয়াছে এবং বিনা প্রতিবাদে কর্তা এই ভারি গাড়ি ঝুঁকিয়া পড়িয়া দড়ি দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছেন। গৃহকর্তা চাকুরে, বাঙ্গালী ভদ্রসন্তান, পরণে অপিসের পোষাক, চাদর কষিয়া বুকে বাঁধা, শীর্ণদেহ, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মাথা দিয়া ঘাম

মাটিতে পড়িতেছে—All work and no play যাহার জীবনের স্লোগান বা নারা বা সংঘনাদ, জীবনের সব কিছু ঝক্‌কি, সমস্ত ধকল যাহাকে পোহাইতে হয়, কাহারো সহানুভূতি যে পায় না, সেই নিপীড়িত, পিষ্ট, ক্লিষ্ট, মূক বাঙ্গালী ভদ্রসন্তানের মুখে ভাষা ফুটাইয়াছেন বিরূপাক্ষ।

একটি সম্পূর্ণ সম্প্রদায় বিরূপাক্ষের কথায়, তাঁহার আলাপ আলোচনা মন্তব্য সমালোচনা, টীকা টীপ্পনীতে, জীবনের প্রায় তাবৎ বিভাগেই নিজের মনের কথা খুঁজিয়া পাইয়াছেন—এইজন্য বিরূপাক্ষের লোকপ্রিয়তা এবং স্রষ্টার জয় জয়কার। সাধারণ মানব, পণ্ডিতদের সমাজে বা মোড়লদের সমাজে যাহার স্থান বা মূল্য নাই, অথচ যাহার দৃষ্টিশক্তি আছে, রসবোধ আছে, ভালমন্দ বিচারের ক্ষমতা আছে এবং স্বীকৃত না হইলেও সমাজের গতি সম্বন্ধে মতামত দিবার যাহার অধিকার আছে, তাহাদের হইয়া বিরূপাক্ষ দু'কথা বলিতেছেন।

চল্‌তি বাঙ্গলার শক্তি যে কত, তাহা বিরূপাক্ষ নূতন করিয়া দেখাইতে পারিয়াছেন! তাঁহার রচনা High brow stuff নহে। সকলেই পড়িয়া বুঝিবে এবং হাসিবে। এই দুঃখদৈন্যের দিনে জাতীয় অধঃপতনের যুগে একটু হাসির দামও যে অসাধারণ সেই হাসি বিরূপাক্ষ অজস্রভাবে পরিবেশন করিয়াছেন। সমাজের এবং মোড়লদের (তাহা রাজনৈতিক হউক আর পাড়ার সর্বজনীন পূজারই হউক) প্রগতি এবং লীলার কোনও কিছু তাঁহার চোখ এড়ায় নাই, কিন্তু একটি অপূর্ব জিনিস, তিনি কাহারও বিরুদ্ধে বিষাক্ত বাক্য প্রয়োগ করেন নাই—তাঁহার ব্যঙ্গ যাহার গায়ে লাগিবে সেও হাসিবে এবং হয়তো সাবধানও হইবে।

এই সহানুভূতিশীল দৃষ্টির জন্য বিরূপাক্ষের জনপ্রিয়তা এত অধিক। বিরূপাক্ষ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে আদর পান—ইহাই কামনা করি।

ডাঃ সুশীলকুমার দে

বিরূপাক্ষ এই নামের মিহি-আড়ালে অর্ধেক আত্মগোপন করলেও তিনি যে কি ধরণের লোক তা' সমজদার পাঠক ও বেতার শ্রোতাদের অজানা নেই। সুতরাং বুঝ নর—যে জান সন্ধান। আর যিনি সন্ধান জানেন না তিনি বই দুখানি দয়া ক'রে কিনে পড়লে ভাল ক'রেই বুঝতে পারবেন। অবশ্য চেয়ে-চিন্তে, ধার ক'রে বা চুরি ক'রে পড়লে—যা বাংলা দেশের অনেক পাঠকই ক'রে আনন্দ পেয়ে থাকেন—তাতে যে রস জমবে না, এবং লেখক ও প্রকাশকের সুবিধা হবে না, সে কথা লেখক নিজেই বেশ পরিষ্কার ক'রেই ব'লে দিয়েছেন।

তবে প্রকাশক অনুগ্রহ ক'রে সমালোচককে এক-এক কপি বিনা মূল্যেই দিয়েছেন। অবশ্য বদান্যতা ক'রে বা নিঃস্বার্থভাবে নয়। তাতে 'উপদেশ' দেওয়া দূরে থাক্, সমালোচকের 'বিপদ' যে কি রকম তা ভূমিকা লেখক শ্রীসজনীকান্ত দাস স্পষ্ট ক'রেই বলেছেন। ভূমিকা লেখক ত' একটা স্তোকবাক্য লিখেই খালাস, কিন্তু সমালোচকের ত' সে উপায় নেই। কারণ, লেখক নিজেই সাধারণ ও উদারভাবে বাংলা দেশের সমালোচকগুষ্টিকে (গুষ্টি কথাই ব্যবহার করলাম!) যে রকম চিমটি কেটেছেন তাতে পরিত্রাণের পথ নেই। ছদ্মনামের আড়াল থেকে বাণ বর্ষণ করবারও জো নেই; তাতে নাকি সমালোচনার মূল্যই থাকবে না, বইয়েরও কাটতি হবে না। এখন কি করি বলুন ত'?

তাই অনেক ভেবে-চিন্তে ঠিক করলাম যে, বই দুখানি প'ড়ে যে আনন্দ পেয়েছি ও যা মনে হয়েছে, তাই ব'লে ফেলাই ভাল, তাতে যে যাই ভাবুক বা যে বিপদই আসুক। আমাদের বর্তমান দুঃখক্লিষ্ট জীবনে বিপদের ত'

অন্ত নেই, ঝঞ্ঝাটও কম নয়, এবং উপদেশ দেবার হিতৈষী লোকেরও অভাব নেই। সেই বিপদ ঝঞ্ঝাট ও উপদেশকে শ্রীবিরূপাক্ষ তাঁর বিরূপ অক্ষির দৃষ্টিভঙ্গিতে ও অপরূপ লেখনীর বিদ্রূপ খোঁচাতে যে অপূর্ব রূপ দিয়েছেন তা' সত্যই উপভোগ্য। বাংলা ভাষায় এ ধরনের বই আর কেউ লিখেছেন ব'লে আমার জানা নেই,—এর সগোত্র খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। লেখক যেন একটা নূতন পথ খুলে দিয়েছেন। অর্থাৎ বলতে চাই—বাংলা ভাষায় রস-রচনার অভাব নেই; এক পদ্মাপার ছাড়া (দোহাই আপনাদের, কথাটা আমার নিজের নয়, আপনাদেরই বঙ্গজ কবি সত্যেন্দ্র দত্তের জবানীতে বলছি!) বাঙালী নাকি নিজেকে রসিকতায় ওস্তাদ মনে করে; তবুও ঠিক এই ধরনের রসিকতা অন্যত্র দেখা যায় না। বই দুখানি যিনি লিখেছেন এটা তাঁরই নিজস্ব ও অননুকরণীয়। কথাটা স্তুতিবাদের মত শোনাচ্ছে, কিন্তু এটা সত্য কি মিথ্যা, ভয়ে-ভয়ে বলছি না খাতিরে বলছি, তা আপনারা বই দুইখানি কিনে পড়লেই বুঝতে পারবেন। আপনারা কিনে পড়বেন ব'লেই বই দু'খানির বিষয়ের ফিরিস্তি বা লেখকের লিপিকুশলতার পরিচয় আর দিলাম না। তবে আপনারা বাঙালী পাঠক, আপনাদের সম্বন্ধে কোন কথা জোর ক'রে বলা যায় না, বলবার সাহসও আমার নেই।

ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীবিরূপাক্ষ সাহিত্য ও বেতার জগতে বিশেষ সুপরিচিত। সম্প্রতি তাঁহার বেতারে প্রদত্ত বক্তৃতামালা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার এই বইগুলি পড়িয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। আমাদের সমাজে প্রাচীন যুগের জের টানিয়া একটি শূন্যগর্ভ আদর্শবাদ প্রচলিত আছে। কিন্তু এই আদর্শবাদ আমাদের বাস্তব জীবননীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। বাস্তব জীবনে অপ্রযুক্ত আদর্শবাদ ভণ্ডামীর পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে এবং দীর্ঘকাল ভণ্ডামীর আবহাওয়ায় বাস করিয়া আমাদের সৃষ্টি-শক্তিও ক্ষীণ ও গতানুগতিক হইয়া পড়ে। বিরূপাক্ষ মহাশয় যে মুখরোচক জীবননীতি প্রচার করিয়াছেন তাহার সত্যতা আমরা মুখে স্বীকার না করিলেও মনে মনে অনুভব করি। আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন বাস্তবিকই এইরূপ জীবননীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাঁহার রচনায় এই বাস্তব জীবনের প্রচলিত নীতিবাদ উপভোগ্য সরসতার সহিত বিবৃত হইয়াছে। তাঁহার লিখনভঙ্গী, উপদেশ দিবার প্রণালী ও অভিজ্ঞতার পরিবেশন আমাদের অন্তরের নিকট আবেদন জানায়। দীর্ঘকাল শূন্যগর্ভ আদর্শবাদের কথা শুনিতে শুনিতে আমরা সত্যের সহিত সম্বন্ধচ্যুত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। এই ক্লান্তি ও অবসাদের প্রতিষেধকরূপে বিরূপাক্ষের চাট্‌নী-চুট্‌কী জাতীয় মন্তব্য সত্য সত্যই আমাদের জিহ্বাতে নূতন রস আস্বাদনের তৃপ্তি আনিয়া দেয়।

আরও একটি কারণের জন্য তাঁহার গ্রন্থগুলি উপভোগ্য! কিছুদিন পূর্বে অন্য এক প্রসঙ্গে আমি মন্তব্য করিয়াছিলাম যে control প্রথার লাঞ্ছনা ও দুর্গতি ইহার উপহাস্য দিকটাকে চাপা দিয়াছে এবং যাহা হাসির উপাদান

হইতে পারিত তাহা গুরুভার পাষাণের মত বুকে চাপিয়া আমাদের শ্বাসরোধ করিতেছে। বিরূপাক্ষের লেখাগুলির মধ্যে আমার এই আশঙ্কা কিয়ৎ পরিমাণে অপনোদিত হইয়াছে। বাঙালী যে তাহার বর্তমান দুর্দশাকে লঘু উপেক্ষার দ্বারা হাস্যরসের উপাদানে রূপান্তরিত করিতে পারিয়াছে ইহাতে প্রমাণ হয় যে, আমাদের মানসিক স্থিতিস্থাপকতা সম্পূর্ণ নষ্ট হয় নাই। বিরূপাক্ষের রচনাগুলি ভবিষ্যতের জন্য এই আশ্বাসের বাণী বহন করে বলিয়া তাহাদের মূল্য আরও বাড়িয়াছে। আমি সানন্দে এই রচনাগুলিকে আমার অভিনন্দন জানাইয়া চিরন্তন সাহিত্য ক্ষেত্রে তাহাদের যে স্থান হইবে এই আশা-পোষণ করি।
